POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর; এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।’
(আল-বাকারা: ২০২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ   وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা 28
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 12 জুলাই , 2018 27 শওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে।

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা কখনও এরূপ চিন্তা করিবে না যে, “আমরা তো বাহ্যিকভাবে বয়াত গ্রহণ করিয়াছি।”

বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব মুক্ত হইতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না। আল্লাহতালার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা-মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ এবং তদ্রুপ অন্যান্য না-জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী কু-সঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং স্ত্রী স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যাহা বয়াত করিবার সময় করিয়াছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতভুক্ত নহে।

এই সমুদয় কাজ বিষবিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে অবস্থান করিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতায় পূর্ণ এবং যে খোদার সহিত সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখে না, সে কখনই আশিসের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা পবিত্রচেতা লোকদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হইতে নির্মল করেন এবং আপন খোদার সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ, তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ কারণ তাঁহারা খোদাতালার ক্রোড়ে উপবিষ্ট এবং খোদাতালা তাঁহাদের সহায় আছেন।

কাহারা খোদার উপর ঈমান আনিয়াছেন? কেবল তাঁহারাই, যাহারা উক্ত রূপ। এমনিভাবে এই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দূরন্ত পাপী দুরাত্মা ও দুরাশায় ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তিত থাকে, -কারণ সে-তো নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাল হইতে কখনও এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই যে, খোদাতালা সাধু ব্যক্তিদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছেন, বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে সর্বদাই মহানিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও প্রদর্শন করিবেন। সেই খোদা, অতীব বিশ্বস্ত খোদা। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, দুনিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্ত পেষণ করে, কিন্তু খোদাতালা যিনি তাহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক

এরপর ১৩ পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

১১ই মে, ২০১৬

ডেনমার্কের মিডিয়ায় হুযুর আনোয়ারের সফর সংক্রান্ত খবরাখবর

ডেনমার্কের স্থানীয় পত্রিকা Hvidover Avls ১০ই মে প্রকাশিত পত্রিকায় হুযুর আনোয়ার এবং মসজিদ নুসরাত জাহাঁর সুস্পষ্ট চিত্রসহকারে নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রবন্ধ ছাপে।

৫০ বছর পূর্বে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। বিশ্ব-আহমদীয়া ইমাম যখন নুসরাত জাহাঁ মসজিদ পরিদর্শন করেন তখন তা 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' স্লোগান এর মূল উপপাদ্য ছিল।

মধ্য-পূর্ব থেকে পারস্পরিক সংঘাতের সংবাদ সত্ত্বেও গত সপ্তাহে নুসরাত জাহাঁ মসজিদে আনন্দের পরিবেশ ছিল। মসজিদ নুসরাত জাহাঁ যেখানে ডেনমার্কের প্রথম মসজিদ, বরং উত্তরের দেশগুলির প্রথম গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ যেটি Kirkegade এবং Eriksmindle এর মধ্যবর্তী এক শান্ত পরিবেশে অবস্থিত। এই মসজিদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ব-আহমদীয়া মসুলিম জামাতের সম্মানীয় নেতা খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ উপস্থিত ছিলেন। এই জামাত ইসলামের একটি সংশোধিত জামাত। ২০৭ টি দেশে এদের কোটি কোটি অনুসারী বসবাস করে। বিরোধিতা এবং মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘু জামাত হওয়া সত্ত্বেও এটি মুসলমানদের অনেক বড় সংগঠন যা আধ্যাত্মিক নেতা এবং খলীফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

সম্প্রতি Hvidover কাউন্সিলের মেয়র এবং কিছু অন্যান্য কাউন্সিলর সদস্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে খলীফার বার্তা ছিল শান্তির উদ্দেশ্যে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। শান্তি বর্তমানের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা। মানুষের মধ্যে সাম্য ধর্মের উর্দ্ধে। এটি ছিল দ্বিতীয় বার্তা।

অতঃপর তিনি বলেন: আমরা যদি পরস্পরকে হত্যা করে ফেলি তবে ধর্মের অনুশীলন করার জন্য কারা অবশিষ্ট থাকবে। এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি একথার পুনরাবৃত্তি করেন যে, ধর্মের পূর্বে মানবতার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

১৯৬৬ সাল থেকে Hvidover

এলাকায় একটি নয়নাভিরাম ভবন নির্মিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটি কয়েক দশক থেকে ডেনমার্কে একটি গঠনমূলক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদারতা, সহানুভুতি এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা সহকারে বসবাস করছে ও কাজ করছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অসংখ্য মানুষ এখানে আসেন যাদের মধ্যে রয়েছেন পর্যটক, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবিশ্বাসের মানুষ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত এবং সাংসদ। এই দেশের নেতা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদর বলেন, আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্যও আমাদের ইচ্ছা হল, আমরা যেন সমাজের এই কাজ ও সেবা পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে করতে পারি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামে বৈশ্বিক স্তরে একটি শান্তিপূর্ণ ও সক্রিয় জামাত যার উদ্দেশ্য হল শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করা। ১৮৮৯ সালে এর গোড়াপত্তন করেন হযরত ভারতের মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮)। যিনি সেই যুগে নিজেকে ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে দাবী করেন। তাঁর চেষ্টা ছিল ব্যক্তিগতভাবে যেন প্রত্যেকের খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর অনেক ভ্রান্ত মতবিশ্বাস যা কালের প্রবাহে প্রচলন পেয়েছিল এবং ইসলামের অংশে পরিণত হয়েছিল সেগুলিকে তিনি অপসরণ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি তরবারি যুদ্ধের পরিবর্তে কলমের জিহাদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ৮০টিরও বেশি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন।

ডেনমার্কে ১৯৫০ এর দশক থেকে ইসলাম আহমদীয়া দেশের সর্বপ্রাচীন সংগঠন। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম ডেনিশ ভাষায় কুরআন অনুদিত হয়ে প্রকাশ পাওয়া। Hvidover -তে উত্তরের দেশগুলির সর্বপ্রথম গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করে তাদের মহিলা সংগঠন। এই মুসলিমরা শান্তির প্রতীক হিসেবেও পরিচিত। এছাড়া অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা, বৈঠক, প্রদর্শনী, চ্যারিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ, রক্তদান এবং আশ্রয়হীনদের আহার করানো ইত্যাদি সেবামূলক কাজ করে চলেছে। ইমাম বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। ২০৭টি দেশে যেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, আমাদের কয়েক কোটি সদস্য সমাজের সক্রিয় অংশ এবং সমাজ কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। আমরা আমাদের স্লোগান 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এর অধীনে মানুষের সঙ্গে ধর্মীয়, আঞ্চলিক এবং বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদ এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। (এই পত্রিকা পাঠকের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার)

Kristeligt Daghblad ১১ই মে তারিখে নিজের প্রকাশনায় লেখে- (এটি জাতীয় পত্রিকা যার পাঠক সংখ্যা এক লক্ষ পনের হাজার। এটি দেশের সর্বাধিক পাঠক সংখ্যার ধর্মীয় পত্রিকা। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ নিম্নরূপ)

মুসলমান নেতার সঙ্গে চার্চ মিনিস্টারের শান্তি প্রসঙ্গে পরস্পর মত বিনিময়।

আহমদীয়া মুসলমানদের বিশ্ব-নেতা সম্প্রতি ডেনমার্ক সফরে ছিলেন। তিনি চার্চের মিনিস্টার Bertel Haarder -এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং শান্তি প্রসঙ্গে কথা বলেন এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

বিলটন হোটেলের কনফারেন্স হল Ellehammer Ballroom

খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-এর প্রতীক্ষায় সকলের মনে প্রশ্ন জেগে উঠছিল যে, যখন তিনি প্রবেশ করবেন তখন আমরা কি উঠে দাঁড়াব আর তার দিকে পিছন করে বসা যায় কি?

আহমদী মুসলমানদের আধ্যাত্মিক বিশ্ব নেতা মুসলমান দেশগুলির বিরোধীতার কারণে লন্ডনে অবস্থান করছেন যেখান থেকে তিনি এই বিশ্বজনীন জামাতকে নেতৃত্ব দান করছেন। এগারো বছর পূর্বে তিনি ডেনিশ জামাত পরিদর্শনের জন্য কোপেনহেগ্যান এসেছিলেন। সেই সময় থেকে তাঁর জন্য যেভাবে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করা হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নুইয়ে পড়া কোমরগুলি পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে সম্মান প্রদর্শনের কারণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর প্রচুর ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ব্রাউন আচকন এবং সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে লাল শতরঞ্জির বেয়ে মঞ্চে উঠে আসেন। এখানে তিনি চার্চ ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী Bertel Haarder (v) এবং নুসরাত জাহাঁ মসজিদের ইমাম মহম্মদ যাকারিয়া খানের মধ্যবর্তী আসনটি গ্রহণ করেন।

প্রায় ১৫০ অতিথি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নৈশভোজের পূর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে যাবতীয় বিষয়ে ন্যায়নীতি অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হয়, এমনকি শত্রুর বিষয়েও। এরপর Bertel Haarder নিজের বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, চার্চ মন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হল ডেনমার্কে সমস্ত ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা। এরপর তিনি বলেন, ডেনমার্কে সরকারিভাবে ১৬০ টি ধর্মীয় সংগঠন আছে, যাদের প্রত্যেকের নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং তা অনুশীলন করার স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম আহমদীয়া জামাত এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা, তাদের সদস্যরা এই সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে, যতদিন থেকে আপনারা বসবাস করছেন, এমন শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে থাকায় আমরা আনন্দিত। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আপনাদের জামাত প্রকৃতই উদারভাবে এই ধর্মকে উপস্থাপন করে থাকে যার নীতিবাক্য হল 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। Bertel Haarder

বলেন, এই বার্তা শুনতে হয়তো খুবই সাধারণ মনে হয়, কিন্তু এমনটি নয়। তিনি এর উপর জোর দিয়ে বলেন যে, এটিই সেই বিষয় যা এই সময় একান্ত জরুরী যখন কিনা সন্ত্রাসবাদের বিপদ বেশ করে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে, এই কারণে যে, অনেক এমন আক্রমণ তাদের পক্ষ থেকে ইসলামের নামে করা হয়ে থাকে। এই কারণে এই বিষয়ের অনেক বেশি প্রয়োজন, কেননা এটি ইসলামের একটি শাখা যা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ আলাদাভাবে করছে। চার্চ মিনিস্টারের এই বক্তব্যের পর প্রধান বক্তা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব শ্রোতাদের সামনে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাসমূহের বিষয়ে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন-

এরপর ১৪ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবা হযরত উকাশা বিন মিহসান, হযরত খারেজা বিন যায়েদ , হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ, হযরত মুয়াত্তিব বিন উবায়েদ, হযরত খালিদ বিন বুকায়ের রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর অনুপম সুন্দর গুণাবলী, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি অনুরাগ, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ধর্মের সেবা এবং সুমহান ত্যাগস্বীকারের বর্ণনা

ইউগান্ডার মুবাল্লিগ শ্রদ্ধেয় ইসমাঈল মালাগালা সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১লা জুন, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১ এহসান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: রসূলে করীম (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত উকাশা বিন মিহসান। হযরত উকাশা বিন মিহসানকে বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়। বদরের যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেদিন তার তরবারি ভেঙে যায়, তখন রসূলে করীম (সা.) তাকে একটি কাঠের টুকরা দেন। তাঁর হাতে সেটি লোহার মত অনেক ধারালো এবং নিখাঁদ তরবারি হয়ে যায় আর তিনি এর দ্বারাই যুদ্ধ করেন, এমন কি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিজয় দান করেন। এরপর এই তরবারি নিয়েই তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আর এই কাঠের তরবারিটি মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছেই ছিল। অর্থাৎ সেই তরবারির নাম ছিল 'অওন'। রসূলে করীম (সা.) তাঁকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫, উকাশা বিন মিহসান)

বদরের যুদ্ধের সময় রসূলে করীম (সা.) সাহাবীদের বলেন, আরবের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আমাদের সাথে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি কে? তিনি (সা.) বলেন যে, উকাশা বিন মিহসান।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা; ৪৩৫, ২০০১ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলে করীম (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমার উম্মত থেকে একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার আর তাদের চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উকাশা বিন মিহসান তখন নিজের চাদর নিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। এরপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, 'সাবাকাকা বেহা উকাশা' অর্থাৎ এই বিষয়ে উকাশা তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৩৬৯)

এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার সীরাত গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর মজলিসে এই কথার উল্লেখ হয়। তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা এমন ঐশী মর্যাদায় উপনীত থাকবে আর তাদের জন্য ঐশী দয়া ও কৃপা এত বেশি উথলিত হবে যে, তাদের কোন প্রকার হিসাবের প্রয়োজন হবে না। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করবে যেভাবে চতুর্দশী চাঁদ আকাশে জ্বলজ্বল করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই পুরো ঘটনা বর্ণনা করার পর, অর্থাৎ হযরত উকাশা বলেন যে, আমার জন্য দোয়া করুন আর তিনি (সা.) দোয়া করেন যেন তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি এই বিস্তারিত বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং এর বিশ্লেষণও করেছেন, তিনি লিখেন যে, এটি বাহ্যত রসূলে করীম (সা.)-এর মজলিসের ছোট একটি ঘটনা হলেও তত্ত্বজ্ঞানের এক ভাণ্ডার নিজের মাঝে লুকিয়ে রেখেছে। প্রথমত এখান থেকে এ জ্ঞান অর্জিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর আল্লাহ্ তা'লার এত বেশি দয়া এবং কৃপা রয়েছে আর রসূলে করীম (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ এত উন্নত পর্যায়ের যে, তাঁর উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক এমন হবেন যারা নিজেদের উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং খোদা তা'লার বিশেষ দয়া ও কৃপার কারণে কিয়ামত দিবসে হিসাব নিকাশের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। (সত্তর হাজার বলতে এই অর্থও ধরা হয় যে, এটি একটি বড় সংখ্যা হবে।) দ্বিতীয়ত এ থেকে এ বিষয়টিও জানা যায় যে, রসূলে করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এত নৈকট্যের অধিকরী যে, তাঁর ঐশী মনোযোগের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষনাৎ কাশফ বা ইলকার মাধ্যমে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেন যে, উকাশাও সেই সত্তর হাজারের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে আর এটিও হতে পারে যে, উকাশা ইতিপূর্বে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁর (সা.) দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই সম্মান দান করেছেন। তৃতীয়ত এই ঘটনা থেকে এটিও জানা যায় যে, রসূলে করীম (সা.) খোদা তা'লার সম্মানের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি তাঁর উম্মতের মাঝে চেষ্টা প্রচেষ্টা অর্থ াৎ আমলকে এত বেশি উন্নতি দিতে চেয়েছিলেন যে, উকাশার পর দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে একই ধরনের দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি এই ঐশী মর্যাদা লাভের বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে যা এই পবিত্র দলভুক্ত লোকেরা অর্জন করেছে একক ব্যক্তির জন্য আরো দোয়া করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাকওয়া, ঈমান এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, এদিকে দৃষ্টি থাকলে তোমরা এই মর্যাদা লাভ করতে পারবে। চতুর্থত এর ফলে তাঁর অর্থাৎ রসূলে করীম (সা.)-এর উন্নত চরিত্রের বিষয়টিও অসাধারণভাবে দেদীপ্যমান হয়। কেননা তিনি (সা.) এমনভাবে অস্বীকার করেন নি যার ফলে দোয়াপ্রার্থী সেই আনসারীর মনে কষ্ট লাগবে বরং খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে এ বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৬৬৮-৬৬৭)

রসূলে করীম (সা.) হযরত উকাশাকে বিভিন্ন সারাইয়ায় [অর্থাৎ মহানবী (সা.)- যুদ্ধ বা অভিযানে নিজে অংশ গ্রহণ করতেন না।] বা যুদ্ধে যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হতো সেগুলোর আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উকাশাকে ৪০জন মুসলমানের নেতা বানিয়ে বনি আসাদ গোত্রের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্র বসতি স্থাপন করে রেখেছিল একটি ঝর্ণার কাছে, যার নাম ছিল গামার, যা মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী পথে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উকাশার দল দ্রুত সফর করে তাদের নিকটে

পৌঁছে যায় যেন তাদেরকে দূর্বৃত্তি থেকে বিরত রাখা যায়। তখন জানা যায় যে, এই গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। তখন উকাশা এবং তার সঙ্গী সাথিরা মদীনায় ফিরে আসেন আর কোন যুদ্ধ হয় নি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৬৬৬)

অর্থাৎ যদিও এই আপত্তি করা হয় যে, তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের বিনা কারণে যুদ্ধ করার শখ ছিল। তারা অকারণে যুদ্ধ করারও কোন চেষ্টা করেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর সূরা আন নাসর অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) হযরত বিলাল (রা.) কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। নামাযের পর তিনি (সা.) একটি খুতবা প্রদান করেন যা শুনে মানুষ অনেক বেশি কান্নাকাটি করে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে লোক সকল! আমি কেমন নবী? তখন লোকেরা উত্তর দেয়, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন, আপনি সর্বোৎকৃষ্ট নবী, আপনি আমাদের জন্য কৃপাকারী পিতার ন্যায় এবং স্নেহপরায়ণ উপদেশদাতা ভাইয়ের ন্যায়। আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর ওহী নিয়ে এসেছেন আর প্রজ্ঞা ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আমাদেরকে আপনি নিজ প্রভুর পথ পানে আহ্বান করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন যা তিনি তাঁর নবীদের দান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে মুসলমানদের দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার এবং তোমাদের ওপর নিজের অধিকারের কসম দিয়ে বলছি, কারো ওপর যদি আমার পক্ষ থেকে কোন অত্যাচার বা অবিচার হয়ে থাকে তাহলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে একই কথা বলেন কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) তৃতীয়বার বলেন, হে মুসলমানদের দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং তোমাদের ওপর নিজের অধিকারের কসম দিয়ে বলছি যে, যদি কারো ওপর আমার পক্ষ থেকে কোন অবিচার বা অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে সে যেন দাঁড়ায় এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিশোধের পূর্বেই আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তখন লোকদের মাঝ থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়ান, তাঁর নাম ছিল উকাশা। তিনি মুসলমানদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে রসূলে করীম (সা.)-এর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান, যদি আপনি বারবার কসম না দিতেন তাহলে আমি কখনোই উঠে দাঁড়াতাম না। হযরত উকাশা বলেন, আমি আপনার সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম, সেখান থেকে ফেরার পথে আমার উটনী আপনার উটনীর নিকটে চলে আসে তখন আমি আমার বাহন থেকে নেমে আপনার নিকটে আসি যেন আপনার পায়ে চুম্বন করতে পারি কিন্তু আপনি আপনার হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন যা আমার পার্শ্বদেশে লাগে। আমি জানি না যে, সেই লাঠি আপনি উটনীর গায়ে মেরেছিলেন নাকি আমাকে? তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপের কসম, খোদার রসূল ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই তোমাকে মারতে পারেন না। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলালকে সম্বোধন করে বলেন, হে বেলাল! ফাতেমার ঘরে যাও আর তার কাছ থেকে সেই লাঠি নিয়ে আস। হযরত বেলাল যান এবং হযরত ফাতেমাকে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মানিত কন্যা! আমাকে সেই লাঠি দিন। তখন ফাতেমা বলেন, হে বেলাল! আমার পিতা এই লাঠি দিয়ে কি করবেন? এটি কি যুদ্ধের পরিবর্তে হজ্জের দিন নয়? তখন হযরত বেলাল বলেন, হে ফাতেমা! আমি দেখছি আপনি নিজের পিতা রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কিছুই জানেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর মানুষকে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলছেন। তখন হযরত ফাতেমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! রসূলে করীম (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে কার মন চাইবে? এরপর তিনি বলেন, হে বেলাল! হাসান এবং হোসেনকে বল, তারা যেন সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলে আর সেই ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে প্রতিশোধ নিতে না দেয়। এরপর হযরত বেলাল মসজিদে আসেন এবং রসূলে করীম (সা.) কে সেই লাঠি দেন আর তিনি (সা.) সেই লাঠি উকাশাকে দেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে কিছু করো না। তখন রসূলে করীম (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আবু বকর এবং উমর! তোমরা থাম, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উভয়ের মর্যাদা জানেন। এরপর হযরত আলী (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে উকাশা! আমি আমার সারা জীবন রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে কাটিয়েছি আর আমার হৃদয় কখনোই এটি সহ্য করতে পারবে না যে, রসূলে করীম (সা.) কে তুমি আঘাত করবে। অতএব আমি আমার দেহ তোমার সামনে রাখছি, তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নাও এবং নির্দ্বিধচিত্তে আমাকে শতবার আঘাত কর কিন্তু রসূলে করীম (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিও না। তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে আলী! বসে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমার নিয়্যত এবং মর্যাদা সম্বন্ধে জানেন। এরপর হযরত হাসান এবং হোসেন দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা রসূলে করীম (সা.)-এর নাতি আর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া রসূলে করীম (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের মতই। তিনি (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আমার প্রিয়রা! বসে যাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে উকাশা! আঘাত কর। হযরত উকাশা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছিলেন তখন আমার পেটের ওপর কাপড় ছিল না, তখন তিনি (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেন, এতে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, উকাশা কি সত্যি সত্যিই রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আঘাত করবে? কিন্তু হযরত উকাশা যখন রসূলে করীম (সা.)-এর দেহের শুভ্রতা দেখেন তখন তিনি পাগলপারা হয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং তাঁর (সা.) দেহে চুমু খেতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার হৃদয় চাইবে যে, সে আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে? তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করবে? তখন হযরত উকাশা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এই আশায় ক্ষমা করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন। তখন তিনি (সা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গী দেখতে চায় সে যেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে নেয়। অতএব মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়ে হযরত উকাশার মাথায় চুমু দিতে থাকে এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে যে, তুমি অনেক উন্নত মর্যাদা এবং রসূলে করীম (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করেছ।

(মাজমায়েয যোওয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৯-৪৩১)

অতএব এই ছিলেন হযরত উকাশা। তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান, কী জানি আবার কখনো এ সুযোগ পাওয়া যায় কিনা, রসূলে করীম (সা.) তো নিজের ফিরে যাওয়ার সংবাদ দিচ্ছেন তাই তিনি ভাবলেন, এটিই সুযোগ, জীবিত থাকতেই তাঁর (সা.) দেহকে শুধুমাত্র চুম্বনই করব না বরং আদর করব।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে হযরত উকাশা মুরতাদদের শায়েস্তা করার জন্য রওয়ানা হন, ঈসা বিন উমায়লা নিজ পিতার সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মানুষের মুকাবিলায় রওয়ানা হওয়ার সময় যদি আযান শুনতেন তখন হামলা করতেন না আর যদি আযান না শুনতেন তাহলে হামলা করে দিতেন। তিনি (রা.) যখন সেই জাতির কাছে পৌঁছান যারা বাযাহা নামক স্থানে ছিল, তখন তিনি হযরত উকাশা বিন মিহসান এবং হযরত সাবেত বিন আক্রামকে গুপ্তচর বানিয়ে প্রেরণ করেন যে, শত্রুদের সংবাদ নিয়ে আস। তারা উভয়ে ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। হযরত উকাশার ঘোড়ার নাম ছিল আর-রেযযাম আর হযরত সাবেতের ঘোড়ার নাম আল মুহাব্বার। এই উভয়ের মোকাবিলা হয় তুলায়হা এবং তার ভাই সালামার সাথে যারা মুসলমানদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাদের বাহিনীর আগে এসেছিল। তুলায়হার মোকাবিলা হয় হযরত উকাশার সাথে আর সালামার মোকাবিলা হয় হযরত সাবেতের সাথে আর এই উভয় ভাই-ই সেই দুইজন সাহাবীকে শহীদ করে। আবু ওয়াকেদ লাইসি বর্ণনা করেন, আমরা দুইশ অশ্বারোহী বাহিনীর আগে আগে চলছিলাম। আমরা এই উভয় নিহত অর্থাৎ হযরত সাবেত এবং হযরত উকাশার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি এমন কি হযরত খালেদ আসেন এবং তার নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত এবং হযরত উকাশাকে তাদের রক্ত রঞ্জিত কাপড়েই দাফন করি। এই ঘটনা বারো হিজরী সনের। " এভাবে তাদের শাহাদাত হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৫, সাবিত বিন আকরম)

হযরত খারেজা বিন যায়েদ রসূলে করীম (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত খারেজা বিন জায়েদের সম্পর্ক খাযরাজের বংশ আগাযের সাথে ছিল। হযরত খারেজার কন্যা হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, যার গর্ভে হযরত উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত খারেজা বিন জায়েদ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। তিনি গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ

সাহাবীদের মাঝে তাকে গণনা করা হতো। তিনি উকবায় বয়আত গ্রহণ করেছিলেন।"

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৫, সাবিত বিন আকরম)

মদীনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদের ঘরে অবস্থান করেন।"

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪০, খারেজা বিন যায়েদ)

তিনি অর্থাৎ হযরত খারেজা বদরের যুদ্ধে অংশ নেন আর ওহুদের যুদ্ধে অনেক সাহসিকতা এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তিনি বর্শা বিদ্ধ হন এবং তার গায়ে তেরোটি আঘাত লাগে। তিনি আহত অবস্থায় নিষ্প্রাণের মতো পড়েছিলেন এমন সময় সাফফান বিন উমাইয়া তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখে চিনতে পেরে তার ওপর হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে আর তার লাশও বিকৃত করে এবং বলে, এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলী অর্থাৎ আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিল। আজ আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদের হত্যা করার এবং নিজের হৃদয় প্রশান্ত করার সুযোগ পেয়েছি। সে হযরত ইবনে কাউকাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অউস বিন আরকামকে শহীদ করে। হযরত খারেজা এবং হযরত সাদ বিন রাবি পরস্পর চাচাত ভাই ছিলেন, তাদের উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়। "

(আল-ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩-৪, খারেজা বিন যায়েদ, ২০০২ সালে বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে হযরত আব্বাস বিন উবাদা উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে মুসলমানের দল! আল্লাহ্ এবং স্বীয় নবীর সাথে যুক্ত থাক, তোমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা তোমাদের নবীর কথা অমান্য করার কারণে হয়েছ। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নি। এরপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা নিজের শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কী এর প্রয়োজন রয়েছে? হযরত খারেজা বলেন, না, তুমি যে জিনিসের আকাঙ্খা কর সেই একই জিনিস আমিও চাই। এরপর তারা সবাই শত্রুর সাথে লড়াই আরম্ভ করেন। আব্বাস বিন উবাদা বলেন, আমাদের চোখের সামনে যদি রসূলে করীম (সা.) কোন আঘাত পান বা কোন কষ্ট পান তাহলে আমরা নিজেদের প্রভুর কাছে কী জবাব দিব? আর হযরত খারেজা বলতেন, আমাদের প্রভুর কাছে আমাদের কোন অজুহাতও থাকবে না আর কোন দলীলও থাকবে না। হযরত আব্বাস বিন উবাদাকে সুফিয়ান বিন আব্দিস শামস সালেমি শহীদ করেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদের দেহে দশটির অধিক তীরের আঘাত লাগে।"

(কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৭-২২৮)

ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দোহ্শাম হযরত খারেজা বিন যায়েদের পাশ দিয়ে যান। হযরত খারেজা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন, তিনি তেরটির মত মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারেজা বলেন, যদি তাঁকে শহীদও করা হয় তবুও আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে জীবিত আছেন আর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। মহম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তুমি তোমার ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ কর।"

(কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, বাব গাযওয়ায়ে ওহদ, পৃষ্ঠা: ২৪৩)

হযরত খারেজার দু'জন সন্তান ছিল। তাদের একজন ছিলেন হযরত যায়েদ বিন খারেজা যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খারেজা বিন যায়েদ–এর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা, যার বিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যখন মৃত্যু হয় তখন তার স্ত্রী হযরত হাবীবা গর্ভবতী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, আমি তার গর্ভে কন্যা সন্তানের আশা করি। অতএব তার ঘরে কন্যা সন্তানেরই জন্ম হয়।"

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪০-৬৪১, খারেজা বিন যায়েদ)

এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ। তাঁর মাতার নাম আমরা বিনতে আবিদ আততুরুফ ছিল। হযরত যিয়াদের এক পুত্র ছিলেন আব্দুল্লাহ্। উকবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন সাহাবীর সাথে তিনি উপস্থিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন তিনি এসেই নিজের গোত্র বনু বেয়াযার মূর্তি সমূহ ভেঙে ফেলেন, যারা মূর্তি পূজা করত। এরপর তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি রসূলে করীম (সা.) যখন মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন তিনিও রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে হিজরত করেন। তাই হযরত যিয়াদকে মুহাজের আনসারী বলা হয়। তিনি মুহাজেরও ছিলেন এবং আনসারও ছিলেন। হযরত যিয়াদ বদর, ওহুদ, খন্দক এবং সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সঙ্গে একই বাহনে সফরসঙ্গী ছিলেন। "

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২, যিয়াদ বিন লাবিদ

রসূলে করীম (সা.) হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছেন এবং বনু বেয়াযা গোত্রের মহল্লার পাশ দিয়ে যান তখন হযরত যিয়াদ তাঁকে (সা.) সুস্বাগতম জানান এবং অবস্থানের জন্য নিজের ঘর উপস্থাপন করেন। তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমার উটনীকে খোলা ছেড়ে দাও, সে নিজেই নিজের গন্তব্য খুঁজে নিবে।

"নবম হিজরীর মহরম মাসে মহানবী (সা.) সদকা এবং যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নিযুক্ত করেন। তখন হযরত যিয়াদকে 'হাযরে মওত' এলাকার জন্য যাকাত ও সদকা সংগ্রহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমরের যুগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কুফায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।"

(সারওয়ারে কায়েনাত কে পাচাস সাহাবা, প্রণেতা তালিব আল হাশিমি)

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন ধর্ম-ত্যাগের নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায় আর মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন আশআস বিন কায়েসুল কান্দিও ধর্ম ত্যাগ করে। তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হযরত যিয়াদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি যখন তার ওপর হামলা করেন তখন সে নাহীর দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত যিয়াদ তাকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন, এমনকি সে অতিষ্ঠ হয়ে এই বার্তা প্রেরণ করে যে, আমাকে এবং আরো নয় ব্যক্তিকে যদি নিরাপত্তা দেওয়া হয় তাহলে আমি দুর্গের দরজা খুলে দিব। হযরত যিয়াদ বলেন, চুক্তিপত্র লিখে নিয়ে আস, আমি তার ওপর সত্যায়ন ও স্বাক্ষর করে দিব। এরপর সে দরজা খুলে দেয়। পরে যখন সেই চুক্তিপত্র দেখা হয় তখন দেখা যায়, অন্য নয় ব্যক্তির নাম লেখা আছে ঠিকই, কিন্তু সে নিজের নামই লিখতে ভুলে গেছে। অতএব তাকে অন্যান্য বন্দিদের সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়।

(ইমতিয়াল আসমা, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪-২৫৫)

রসূলে করীম (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মু'তেব বিন উবায়েদ। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। ভাতিজা উসায়ের বিন উরুয়া তাঁর ওয়ারিশ হন। হযরত মু'তেব বিন উবায়েদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং 'ইয়াওমুর রাজী'তে শাহাদত বরণ করেন। রাজীর সেই ঘটনা যাতে দশজন মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৫, সাবিত বিন আকরম)

এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, এই দিনগুলি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল এবং চতুর্দিক থেকে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে ভীতিপ্রদ সংবাদ আসছিল, কিন্তু তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদ ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে, যারা ওহুদের যুদ্ধের কারণে অনেক সাহসী ও উদ্ধত হয়ে উঠছিল। এই বিপদ অনুমান করতে পেরে রসূলে করীম (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে তাঁর দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের ওপর আহসান বিন সাবেতকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন চুপি চুপি মক্কার কাছে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে (সা.) সংবাদ দেয়। কিন্তু এই দল রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই 'আযল' এবং 'কারা' গোত্রের কয়েকজন লোক তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং বলে, আমাদের গোত্রে অনেক লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আপনি কিছু লোক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। রসূলে করীম (সা.) তাদের এই ইচ্ছার কথা শুনে সেই একই দল যা সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তা তাদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু আসলে যেভাবে পরবর্তীতে জানা গেছে যে, এরা মিথ্যাবাদী ছিল এবং বনু লেহানের উসকানিতে মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিল যেন এই অজুহাতে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা যায়। আর বনু লেহান এই সেবার বিনিময়ে আযল এবং কারার লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কারস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযল এবং কারার এই বিশ্বাসঘাতক লোকেরা যখন আসফান

এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছায় তখন তারা গোপনে বনু লেহান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা চলে আস। তখন বনু লেহানের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশজন তিরন্দাজ ছিল,মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয় আর রাজী' নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলে। দশজন মানুষ দুইশত সৈন্যের কীই-বা মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু মুসলমানদেরকে অস্ত্রসমর্পণের শিক্ষা দেওয়া হয় নি, যদি এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে নির্দেশ হলো, তোমাদেরকে যখন ঘিরে ফেলা হয় তখন যুদ্ধ কর। অতএব সেই সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে কাছের একটি টিলায় উঠে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কাফেররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা কোন দোষনীয় বিষয় ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে, তোমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস আমরা পাকা কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে আমরা হত্যা করব না। আসেম (রা.) তখন উত্তর দেন যে, আমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না, আমরা তোমাদের এই দায়িত্বের কথায় নিচে নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি আকাশের দিকে মুখ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তুমি তোমার রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। মোটকথা আসেম এবং তার সঙ্গীরা তাদের মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী নিহত হন এবং শুধুমাত্র খোবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আরো একজন সাহাবী বাকি রয়ে যান, তখন কাফেররা যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের জীবিত পাকড়াও করা, পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নিচে নেমে আস, আমরা ওয়াদা করছি যে, তোমাদেরকে কোন কষ্ট দিব না। এবার এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা তাদের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিচে নেমে আসে, কিন্তু নিচে আসা মাত্রই কাফেররা তাদের তিরধনুকের রশি দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। এতে খোবায়েব এবং যায়েদের সঙ্গী, যার নাম ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক উল্লেখ হয়েছে, তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি, তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন, এটি তোমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আর জানা নেই যে, সামনে গেলে তোমরা আরো কী কী করবে। অতএব আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তখন কাফেররা আব্দুল্লাহ্কে কিছু দূর পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে দেয়। আর যেহেতু তাদের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাই কুরাইশকে খুশি করার জন্য এবং সেই সাথে অর্থে র লোভে খোবায়েব ও যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে কুরাইশের কাছে বিক্রি করে দেয়। খোবায়েবকে হারেস বিন আমর বিন নওফেলের ছেলে ক্রয় করে নেয়। কেননা বদরের যু দ্ধে খোবায়েব হারেসকে হত্যা করেছিলেন এবং যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে। অবশেষে তাদেরকেও শহীদ করা হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৫১৩-৫১৪)

এরপর বদরী সাহাবীদের মাঝে আরেকজন হলেন হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, হযরত আকেল, হযরত আমের এবং হযরত আইয়্যাস একত্রে দারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এই চার ভাই দারে আরকামে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খালেদ বিন বুকায়ের এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজী-র ঘটনায় শহীদ হন, যে ঘটনার কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দশজন সাহাবীকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছিল। (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৭, আকিল বিন আবি বুকায়ের) বদরের যুদ্ধের পূর্বে রসূলে করীম (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্হাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এতে হযরত খালেদ বিন বুকায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে চৌত্রিশ বছর বয়সে রাজী'র যুদ্ধে আসেম বিন সাবেত এবং মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানবি-এর সাথে আযল ও কারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪৭, খালিদ বিন বুকায়ের)

ইবনে ইসহাক এ সম্পর্কে বলেন, যখন আযল এবং কারা গোত্রের লোকেরা এই সাহাবীদের নিয়ে রাজী' নামক স্থানে পৌঁছে, যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। রাজী' একটি জায়গা যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম এবং হেজাযের পাশে অবস্থিত। সেই লোকেরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থাৎ যেসব লোক তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ধোঁকা দেয় এবং উযায়েল গোত্রকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। সাহাবীরা তখনো তাদের তাবুতেই ছিলেন যখন তারা দেখেন যে, চতুর্দিক থেকে মানুষ তরবারি হাতে নিয়ে তাদের দিকে আসছে। তখন তারাও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সেই লোকেরা বলে যে, খোদার কসম, আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না, বরং আমরা শুধু এটিই চাই অর্থাৎ কাফেররা বলে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব না, আমরা তোমাদেরকে শুধু পাকড়াও করে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাব এবং তাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রতিদানে কিছু আদায় করব। হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.) বলেন, খোদা তা'লার কসম, আমরা মুশরেকদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না। অবশেষে এই তিনজনই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন।"

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৫৯১-৫৯২, যিকরে ইয়াওমির রাজি)

হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.) তাদের সম্পর্কে নিজের এক পঙ্ক্তিতে লিখেন,

'আলা লায়তানি ফিহা শাহেদতু ইবনাতারেক
ওয়া যায়দান ওয়ামা তুগনিল আমানী ওয়া মুরসাদা
কাদ দাফা'তু আন হিব্বী খুবায়ব ওয়া আসেম
ওয়া কানা সিফাউন লাউ তাদারাকতু খালেদা'

অর্থাৎ হায়! আমি যদি এই রাজী'র ঘটনার সময় ইবনে তারেক এবং যায়েদ এবং মুরসাদের সাথে থাকতাম, আর বাসনা কোন কাজে না আসলেও আমি আমার বন্ধু খুবায়েব এবং আসেমকে রক্ষা করতাম। আর যদি আমি খালেদকে পেয়ে যেতাম, তাহলে সেও বেঁচে যেত।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪৭, খালিদ বিন বুকায়ের)

অতএব, এরা ছিলেন সেই সকল পুণ্যাত্মা, যারা ধর্মের হিফাজত বা সুরক্ষার খাতিরে এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য কুরবানী দিয়েছেন আর অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের এক লেখনীতে বলেন যে, "সেই পরম হিতৈষী খোদার শুকরিয়া, যিনি অনুগ্রহকারী এবং দুঃখ মোচনকারী। আর তাঁর রসূলের ওপর দরূদ ও সালাম, যিনি মানব এবং জিনদের ইমাম এবং পবিত্র হৃদয় আর বেহেশতের দিকে আকর্ষণকারী। আর তাঁর সাহাবীদের প্রতি সালাম, যারা ঈমানের ঝর্ণাধারার দিকে তৃষ্ণার্তের ন্যায় দৌড়ে গেছেন এবং অজ্ঞতার অন্ধকার রাতে জ্ঞান এবং আমলের উৎকর্ষে আলোকিত হয়েছেন।"

(নুরুল হক, দ্বিতীয় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

অপর এক জায়গায় সাহাবীদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন যে, তারা দ্বীনের ময়দানের সিংহ এবং রাতের রাহেব এবং ধর্মের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন (রাতের রাহেব হওয়ার অর্থ হলো তারা রাতে ইবাদতকারী আর ধর্মের তারকা)। তারা সকলেই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।" (নাজমুল মাহদী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ১৭) আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান এবং আমলের অবস্থাকে উন্নত করার এবং রাতের ইবাদতের মান উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা উগান্ডার মুবাল্লেগ মুকাররম ইসমাঈল মালাগালা সাহেবের। তিনি গত ২৫ মে ২০১৮ তারিখে জুমুআর নামাযের পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে নিজ প্রভুর সাথে মিলিত হন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ইসমাঈল মালাগালা সাহেব ১৯৫৪ সনে উগান্ডার মাকুনু জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা উভয়ে খ্রিষ্টান ছিলেন। অতএব তিনিও জন্মগতভাবে খ্রিষ্টান ছিলেন। মালাগালা সাহেব আহমদী এক বন্ধু হাজী শোয়েব নাসীরা সাহেবের সম্পর্কের ভাই ছিলেন, তাই তার ঘরে তার আসা যাওয়া ছিল। হাজী শোয়েব সাহেবের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক দীর্ঘকাল প্রশ্নোত্তরের ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তার কাছে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়, আর অবশেষে ১৯৭৮ সনে তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হাজী শোয়েব নাসিরা সাহেবের কাছে বলেন যে, আমি ছোটবেলা থেকেই খ্রিষ্টান পাদ্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এখন যেহেতু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই আমি কি ইসলামের কোন সেবা করতে পারি? তখন তাকে বলা হয় যে, আপনি ইসলামের সেবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তখন মোহাম্মদ আলী কাইরো সাহেব, যিনি এখন উগান্ডা জামা'তের আমীর; তিনি পাকিস্তান থেকে জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা সমাপ্ত করে উগান্ডা পৌঁছেছিলেন। অতএব তিনি ১৯৮০ সনে মালাগালা সাহেবকে আরো পাঁচজন খোদ্দামের সাথে পাকিস্তান প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায়

খুতবার শেষাংশ ১৩ পাতায় .....

জুমআর খুতবা

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যারা তাকওয়ার পথে পরিচালিত, যারা যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের উপর যথাযথভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমলকারী, আল্লাহ্ তা'লার আয়াত বা নিদর্শনাবলীর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হিসেবে আমি অবশ্যই আমার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখব। অতএব মু'মিনের উচিত আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধের উপর আমল করার, তাকওয়ার উপর পরিচালিত হওয়ার, এবং ঈমানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

রমজান মাসে রোযার পাশাপাশি মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের ওপর পূর্বের তুলনায় অধিক আমল করে, নিজেদের ইবাদতকে যদি আরও বৃদ্ধি করে এবং তাক্বওয়ায় উন্নতি করে, তাহলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার রহমতের চাদরে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি আবৃত হয়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে আকর্ষণের মাধ্যম হল তওবা ও ইসতেগফার

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণীর আলোকে তওবা ও ইসতেগফারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর সুমিষ্ট ফল ও কল্যাণরাজির বর্ণনা

আল্লাহ্‌র তা'লার নিরাপত্তা, সাহায্য ও সমর্থন এবং কৃপা লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা , ইসতেগফার এবং দোয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একদা জামাতকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, আমাদের জামাতকে এই দোয়াটি অধিক হারে পাঠ করা উচিত-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة:202)

আমাদেরও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত রাখেন এবং সব ধরনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আগুন থেকে নিরাপদ রাখেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ই জুন, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৮ এহসান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيْٓ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ (الاعراف:157)

তাশাহুদ, তাঊয, সূরা ফাতিহা এবং সূরা আরাফের উপরোক্ত আয়াত পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, এবং তুমি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর। নিশ্চয়ই আমরা তোমার দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছি। তিনি বললেন, আমার শাস্তি আমি যাকে চাই তার উপর আপতিত করি আর আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। অতএব আমি সেসব (কল্যাণ) তাদের জন্য অবধারিত করে দিব যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আমার নিদর্শনাবলীতে পূর্ণ ঈমান আনয়নকারী। (সূরা আল্-আরাফ: ১৫৭)

নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ রয়েছে; যেমনটি এ আয়াত থেকেও প্রতিভাত হয় যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার রহমত (দয়া ও কৃপা) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। রহমতের অর্থ হচ্ছে, নম্র হওয়া, সদয় হওয়া এবং করুণা উদ্বেলিত হওয়া। অর্থাৎ বান্দাদের প্রতি তার কোমল ব্যবহার এবং তাঁর সদয় আচরণের কোন সীমা পরিসীমা নেই। নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার দয়ার্দ্র ব্যবহারের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'লার দয়ার গুণ ও তাঁর দয়ার আচরণ এত বিস্তৃত যে, এটি সব কিছুর উপর ছেয়ে আছে। তাঁর রহমতের মধ্যে রহমানিয়ত এবং রহিমিয়্যত উভয়ই রয়েছে। অযাচিতভাবে তিনি অগণিত জিনিস এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন– এটি হলো তাঁর রহমানিয়্যত। আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী, তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী এবং তাঁর কাছে সমর্পিত হয়ে যারা প্রার্থনা করে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি রহিমিয়্যত গুণের বহিঃপ্রকাশ করেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দাকে শাস্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেকের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, আযাব বা শাস্তিই যদি দিবেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করলেন কেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি (অর্থাৎ শাস্তি দেওয়া) আমার উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, যারা নিজেদের অপকর্মে সীমা ছাড়িয়ে যায় তারা আমার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু আমার এই যে শাস্তি তা-ও সাময়িক। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন এবং মানুষের মাঝে চেতনা জাগ্রত করা। এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন দোযখবাসীরাও আমার ব্যাপক রহমত থেকে অংশ লাভ করবে আর তাদের শাস্তিরও অবসান ঘটবে। দোযখের শাস্তিও তারা তাদের অপকর্মের কারণেই পাবে। এরপর এটি তাদের সংশোধনের কারণে পরিণত হবে। অতএব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই শাস্তিও এক ধরনের সংশোধন। শাস্তির এই যুগও এক দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার রহমত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিচার দিবসের মালিকও বটে। এজন্য আমরা যাদেরকে বাহ্যত গুনাহগার বা পাপাচারী

মনে করি এবং সেসব লোকদেরকে যাদেরকে আমরা পাপাচারী হিসেবে দেখতে পাই, তাদেরকেও তিনি তাঁর দয়া এবং ক্ষমার চাদরে আবৃত্ত করে শাস্তি ছাড়াই মুক্ত করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুণ্যের পথে পরিচালিত হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য এটি অবশ্যই বলে রেখেছেন যে, আমার দয়া সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তাদের প্রতি অবশ্যই আমি আমার দয়া প্রদর্শন করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহ্ তা'লার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যারা তাকওয়ার পথে পরিচালিত, যারা যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের উপর যথাযথভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমলকারী, আল্লাহ্ তা'লার আয়াত বা নিদর্শনাবলীর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হিসেবে আমি অবশ্যই আমার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখব।

এরপর অপর এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (সূরা আল্-আরাফ: ৫৭) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের নিকটতর। মুহসিন বা সৎকর্মশীল হলো তারা যারা যাবতীয় শর্তসহ নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে। অতএব যারা তাক্বওয়ার দাবি পূরণকারী, আল্লাহ্‌র বিধিবিধান পালনকারী, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং যারা আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজেকে সমর্পণ করে- এমন ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ করবে। অতএব মু'মিনের উচিত আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধের উপর আমল করার, তাকওয়ার উপর পরিচালিত হওয়ার, এবং ঈমানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর তখনই একজন মানুষ মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালনকারীদের নিকটতর- আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এটি অবধারিত করে নিয়েছেন এবং তিনি লিখে রেখেছেন যে, যদি তোমরা এমনটি কর তাহলে আমার রহমতের বিশালতা তোমাদেরকে আবৃত করে ফেলবে। কত দয়ালু এবং কৃপালু আমাদের খোদা। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার নগণ্য বান্দামাত্র,বান্দা কীভাবে তার মালিকের কাছে অধিকার দাবি করতে পারে? কিন্তু আকাশ এবং পৃথিবীর সেই অধিপতি বলেন, যদি তোমরা তাকওয়ার উপর পরিচালিত হও, আমার বিধিনিষেধের উপর আমল করে আমার নিদর্শনাবলীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার রহমতের যোগ্য বিবেচিত হবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা প্রথম যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা হলো তাক্বওয়া। আর সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়া সম্পর্কে যদি সঠিক বুৎপত্তি ও জ্ঞান লাভ হয় তাহলে অন্যান্য পুণ্যকর্ম আর ঈমানে পরিপূর্ণতা লাভ করা এর মাঝেই এসে যায়। এ সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) বলেন,

"মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাকওয়ার সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে পরিচালিত হবার মাঝেই নিহিত। তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ হলো, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ছাপ এবং আকর্ষণীয় গঠন ও গড়ন। স্পষ্টতঃই খোদা তা'লার আমানত আর ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহের প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হওয়া উচিত (অর্থাৎ সঠিকভাবে পালন করা) আর আপাদমস্তক মানুষের যত শক্তিবৃত্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যেমন বাহ্যিকভাবে চোখ, কান, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র রয়েছে, এগুলো যতটুকু সম্ভব, যথাক্ষেত্রে ও যথাস্থানে প্রয়োজন অনুসারে (সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহার করা, আল্লাহ্ নির্দেশিত যেসব আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা যথাযথ এবং সঠিকভাবে পালন করা উচিত) আর অবৈধ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের গোপন আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।" (অন্যায় ব্যবহার থেকে এগুলোকে বিরত রাখা আর শয়তান যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তিবৃত্তির মাধ্যমে গোপনভাবে আক্রমণ করিয়ে থাকে তাই এ থেকে সাবধান থাকা- এগুলো হলো মানুষের কাজ। তবেই সে সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত হতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে পারে।) তিনি বলেন, আর এর পাশাপাশি বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারের প্রতিও তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে কেননা এটি সেই পদ্ধতি যার সাথে মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাকওয়া-কে পোশাক নামে অভিহিত করেছেন। অতএব 'লেবাসুত্ তাক্বওয়া' পবিত্র কুরআনেরই একটি শব্দ। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। আর তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সকল আমানত এবং ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারবলী। অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত আর তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারবলী রক্ষার চেষ্টা করা অর্থাৎ এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের ওপর যেন যথাসম্ভব আমল করার চেষ্টা করে।"

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা: ২০৯-২১০)

মানুষের যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, তদনুসারে সে যেন এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর আমল করার চেষ্টা করে।

অতএব মানুষ যদি এই মান অর্জন করে তাহলে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাঁর বান্দাদের জন্য অধিকার হিসেবে অবধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এটি নিজের জন্য আবশ্যক করে নেন। যেমনটি আমি বলেছি যে, অধিকার হিসাবে কিছু নেওয়ার বান্দার কী যোগ্যতা আছে?

আমরা রমজানের দিনগুলো অতিবাহিত করছি, যার শেষ সপ্তাহ এখন বাকি আছে মাত্র। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাব ফাযলু শাহরে রমাযান, হাদীস: ২৪৯৫)

এর দ্বারাও মু'মিনই লাভবান হয়ে থাকে। তারাই লাভবান হবে যারা সঠিকভাবে ঈমান আনে আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে। শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরা এই দিনগুলোতেও এসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় না। পৃথিবীতে অগণিত বৃথা ও অশ্লীল কর্ম প্রতিনিয়তই সম্পাদিত হচ্ছে, রমজানে এগুলো বন্ধ হয়ে যায় নি। অতএব এই সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য , তাকওয়ার উপর পরিচালিত ব্যক্তিদের এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে অংশ লাভকারীদের জন্য। আর সেই সুসংবাদ হল, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রহমতকে তোমাদের জন্য পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ব্যাপকতর করেছেন, অতএব এর থেকে লাভবান হও আর আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাঁর বিধিনিষেধের উপর আমল করার চেষ্টা কর। এই দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার মহানবী(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি এবং নেকীর উদ্দেশ্যে রমজানের রাতে ওঠে এবং নামায পড়ে, তার পূর্বের সকল পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব সাওমু রামাযান, হাদীস: ৩৮)

এটি আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপক রহমতের বিকাশের আরও একটি চিত্র যে, তোমরা একটি মাত্র চেষ্টা কর আর আমি অনেক গুণ বাড়িয়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। কতভাবেই না তাঁর রহমানিয়্যত, রহিমিয়্যত আর রহমতের বিকাশ ঘটছে! অতএব তারা সৌভাগ্যবান যারা এ দিনগুলো থেকে লাভবান হয়। এরপর এটিও তাঁরই দান যে, এই শেষ দিনগুলোতে 'লায়লাতুল ক্বদর' সন্ধানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য পূর্বের তুলনায় আমরা অধিক দেখতে পাই। এটিও আমাদের কোন অধিকার নয় এটি তাঁর দান মাত্র যার মাধ্যমে তিনি বান্দাকে নিজের নিকটতর করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন আর এটিও তাঁর রহমতের ব্যপকতারই পরিচায়ক।

এরপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রমজানের প্রথম দশক রহমত, মধ্যবর্তী দশক মাগফেরাত আর শেষ দশক হলো, আগুন থেকে নাযাত বা মুক্তি।

(কুনযুল আমাল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৩, হাদীস: ২৩৬৬৮, ১৯৮৫ সালে বেরুতে মোসেসাতুর রিসালা দ্বারা প্রকাশিত)

রমজান মাসে রোযার পাশাপাশি মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের ওপর পূর্বের তুলনায় অধিক আমল করে, নিজেদের ইবাদতকে যদি আরও বৃদ্ধি করে এবং তাক্বওয়ায় উন্নতি করে, তাহলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার রহমতের চাদরে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি আবৃত হয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যখন বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে আর এ দিনগুলোতে আমার খাতিরে বিভিন্ন বৈধ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, তখন এমন রোযাদারের প্রতিদান আমি স্বয়ং হয়ে থাকি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল সওম, হাল ইয়াকুলু ইন্নি সায়েমুন, হাদীস: ১৯০৪)

যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং প্রতিদান হয়ে যান, তখন তার জন্য ক্ষমার উপকরণ হয়ে গেল আর যখন ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যায়, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা

মাগফেরাত, ক্ষমাএবং তওবা গ্রহণ করেন, তখন আগুন থেকেও মানুষ মুক্তি লাভ করে। আর ইহকালীন আগুন থেকেও সে রক্ষা পায়, আর পরজগতের আগুন থেকেও সে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু শর্ত হলো, সে যেন একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে রোযা রাখে এবং আমলও করে। এরপর এই আমল তার জীবনের অংশে পরিণত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার রহমতে স্থায়ীভাবে তাদেরকে আবৃত করে রাখার কারণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লার রহমত শুধুমাত্র রমযানের প্রথম দশকেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি প্রথম দশক থেকে দ্বিতীয় দশকে এবং তৃতীয় দশকেও স্থানান্তরিত হয়। মানুষ যতদিন তাকওয়ার উপর পরিচালিত হয়ে দৃঢ় ঈমানের সাথে কার্য সম্পাদন করতে থাকবে ততদিন তা মানুষের সাথে স্থায়ী থাকবে। অনুরূপভবে তাঁর ক্ষমা কেবল মধ্যবর্তী দশ দিনের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং রমজানের শেষ পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও মানুষের সাথে থাকবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আয়ু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করবে। অনুরূপভাবে আগুন থেকে মানুষ কেবল এই দশ দিনই সুরক্ষিত থাকবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয়ে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে রমযান অতিবাহিত করবে, পরবর্তীতেও সে আগুন থেকে দূরে থাকবে। নতুবা রমজানের পর যদি আমাদের ওপর সেই জাগতিকতাই প্রাধান্য পায় এবং তাকওয়া থেকে আমরা দূরে সরে যাই আর আল্লাহ্র বিধিনিষেধের বিষয়ে অমনোযোগী, ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি উদাসীন হয়ে যাই তাহলে এটি তেমন-ই বিষয় যেভাবে মানুষ নিজের জন্য একটি নিরাপদ দুর্গ গড়ে তোলে আর নিজেই তা ভেঙে ফেলে। অতএব এই রমজানে আল্লাহ্ তা'লার রহমতের জন্য, পূর্বের তুলনায় অধিক রহমত লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি মোক্ষম সুযোগ করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম তিনি দান করেছেন। নতুবা আল্লাহ্ তা'লার রহমতও কয়েকদিনের জন্য সীমিত নয় এবং তাঁর ক্ষমাও কয়েক দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁর মাগফেরাত গৃহীত হবার কারণে আগুন থেকে মুক্তি লাভও কয়েক দিনের জন্য বা কিছু দিনের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

অতএব এ বিষয়ের প্রতি আমাদের সর্বদা মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। এ যুগে প্রতিটি পদক্ষেপে হযরত মসীহে মওউদ(আ.) আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, আমরা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং এর বাস্তবতা কি, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে পারি আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর দয়ার চাদরে আবৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করেন বা কীভাবে আমাদের কর্মের প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, কীভাবে আমাদের জন্য ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করেন, কীভাবে আমাদের ক্ষমা লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত যেন তাঁর দয়া স্থায়ীভাবে আমাদের সাথে থাকে-এ সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং তার ব্যাখ্যাও করব।

আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি সেটির ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি যাকে চাই শাস্তি প্রদান করি এবং আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব যারা সকল প্রকারের শিরক, কুফর এবং অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকে আর যাকাত প্রদান করে তাদের জন্য আমি স্বীয় রহমত অবধারিত করে দিব এবং তাদের জন্যও যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান রাখে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৪)

তিনি (আ.) এখানে তিনটি বাক্যে তাকুওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। শিরক থেকে মুক্ত থাকা, কুফর থেকে মুক্ত থাকা এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা। বর্তমানে প্রতিটি পদে নির্লজ্জতার উপকরণ বিদ্যমান। টেলিভিশন, ইন্টারনেটে এবং প্রচারমাধ্যমে অনর্থক ও বাজে বিভিন্ন বিষয় আমরা দেখতে পাই। তাই এগুলোতে অশ্লীল যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলো থেকে মুক্ত থাকাও আল্লাহর রহমতকে আকৃষ্ট করার কারণ হয়ে থাকে। রমজানের এ দিনগুলোতে রোযা রাখার জন্য মানুষকে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয় এবং অন্যান্য ব্যস্ততাও আছে। তাই হয়ত অনেক মানুষ এসব বাজে কাজে জড়ায় না অথবা এ সমস্ত বাজে প্রোগ্রাম দেখে না বা এগুলো থেকে মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে স্থায়ীভাবে বিরত থাকা আবশ্যক। এগুলো এমন বিষয়, যা সম্পর্কে আজকাল বিশেষ করে যুবসমাজ, বরং বড়দের বিষয়েও অভিযোগ আসে যে, তারা তাদের মন ও মস্তিষ্ক কলুষিত করছে। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্রও নষ্ট হচ্ছে আর মানুষ ঈমান থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ থেকে বাঁচার জন্য পূর্ণ মনোযোগের সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে আর এ জিনিসগুলোর সঠিক, যথাযথ এবং সতর্ক ব্যবহার করা উচিত।

এরপর আরেক জায়গায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, খোদা তা'লার রহমত সার্বজনীন এবং বিস্তৃত আর গজব বা ক্রোধ অর্থাৎ ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হলো মানুষ যখন ঐশী আইন লঙ্ঘন করে তখন এটি কার্যকর হয়।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৭)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে শাস্তি প্রদান করেন তা এ জন্য যে, সে আল্লাহ্ তা'লার আইন লঙ্ঘন করেছে আর যেভাবে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তিও সংশোধনের নিমিত্তেই দেওয়া হয় এবং অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার রহমত বা দয়াই প্রাধান্য লাভ করে। অতএব স্পষ্ট থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি যদি থেকে থাকে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কারো প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাহলে তা এ কারণে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ রহমতকে বিস্তৃত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ঐশী শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়।

এর আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.) বলেন, "শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। শুধু এতটুকু থাকে যে, খোদা তা'লা স্বীয় 'কুদ্দুসিয়্য'ত বা পবিত্রতার বৈশিষ্ট্যের দাবি হল অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা। এরপর অপরাধী ব্যক্তি যখন তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারি এবং হৃদয়ের বিগলনের মাধ্যমে সেই দাবি পূর্ণ করে দেয় তখন ঐশী রহমতের দাবি শাস্তির দাবির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর সেই শাস্তিকে নিজের মাঝে আচ্ছন্ন ও আবৃত করে নেয়। এটিই এই আয়াতের অর্থ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (আল-আরাফ: ১৫৭) অর্থাৎ "رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي-"

(তোহফায়ে গাযনবী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ৫৩৭)

যার অর্থ আমার রহমত বা কৃপা আমার শাস্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মানুষ যখন তওবা করে, ইস্তেগফার করে, আহাজারি করে, দোয়া প্রার্থনা করে আর এর দাবি যখন সে পূর্ণ করে বা এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তিনি বলেন যে, তখন আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেওয়াকে নিজের জন্য অনিবার্য করে নেন নি বরং নিজের জন্য তিনি যদি কিছু আবশ্যক করে থাকেন তবে তা হলো এমন লোকদের প্রতি দয়া করা। তখন তাঁর দয়া তাঁর শাস্তির দাবির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর শাস্তি উধাও হয়ে যায় এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যায়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ করার মাধ্যম হলো, তওবা ও ইস্তিগফার। ইস্তেগফারের দর্শন কী? এর অর্থ কী?-এ সম্পর্কে তিনি(আ.) বলেন, "ইস্তেগফারের প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় এবং খোদা যেন (মানবীয়) প্রকৃতিকে নিজ সহায়তা প্রদান করেন আর তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত করে নেন। (এস্তেগফার করার কারণ হলো, মানুষ যেহেতু দুর্বল তাই মানুষের মাঝে যে দুর্বলতা আছে তা যেন প্রকাশ না পায় এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ শক্তি বলে মানব প্রকৃতিকে সহায়তা প্রদান করেন আর পাপ ও ভুলক্রটি সম্পাদিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।) তিনি বলেন, এই শব্দটি 'গাফারা' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ ঢেকে রাখা। অতএব এর অর্থ হচ্ছে খোদা তাঁর শক্তি বলে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতা ঢেকে রাখেন। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তেগফার করে তার যে প্রকৃতিগত দুর্বলতা আছে অর্থাৎ মানব প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা থাকে তা যেন আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রাখেন এবং তা প্রকাশ না পায় আর সেই দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত না হয়।) কিন্তু এরপর সাধারণ মানুষের জন্য এই শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে আর এই অর্থও করা হয়েছে যে, খোদা যেন সংঘটিত পাপও ঢেকে রাখেন (অর্থাৎ মানুষ যে পাপ ইতিমধ্যে করে বসেছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তা-ও ঢেকে রাখেন, এর মন্দ প্রভাব থেকে যেন রক্ষা করেন, এর ফলে যে শাস্তি অবধারিত ছিল তা থেকে যেন রেহাই দেন।) কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা যেন তাঁর ঐশী শক্তি দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনাকারী অর্থাৎ যে ইস্তেগফার করে তাকে প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেন এবং নিজ শক্তি হতে শক্তি দান করেন আর নিজ জ্ঞান হতে জ্ঞান দান করেন এবং নিজের আলোতে আলোকিত করেন। কেননা খোদা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে

যান নি বরং তিনি যেভাবে মানুষের স্রষ্টা এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল শক্তিবৃত্তির স্রষ্টা অনুরূপভাবে তিনি মানুষের জন্য 'কাইয়্যুম' খোদাও বটে। অর্থাৎ তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে নিজের বিশেষ সহায়তায় সুরক্ষাকারী। অতএব খোদা তা'লার নাম কাইয়্যুমও বটে, অর্থাৎ তিনি নিজ সহায়তায় তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, এ কারণেই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো যেভাবে সে খোদা তা'লার খালেকিয়্যত বা সৃষ্টিকরণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে অনুরূপভাবে সে যেন নিজ সৃষ্টির (আত্মিক) গড়নকে খোদা তা'লার কাইয়্যুমিয়াত বা স্থায়িত্ব দানকারী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে। "

(আসমাতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১৮, পৃষ্ঠা: ৬৭১)

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেন নি। তিনি কাইয়ুম বা স্থিতিদাতাও বটে। অতএব মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে। যদিও মানুষকে আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা, উপায় উপকরণ এবং সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম আল্লাহ্ তা' লা নির্ধারণ করেছেন সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হয়, এটি আবশ্যক। অতএব তিনি বলেন, জন্মের ক্ষেত্রে যেভাবে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টা রয়েছে এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লা এর ফলাফল সৃষ্টি করেন , তাই এটিও আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিচালিত হওয়ার জন্য, সেগুলোর ওপর আমল করার জন্য খোদার যে কাইয়্যুম বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত, তোমাদের তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। তাঁর নির্দে শ অনুসারে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দোয়া এবং ইস্তেগফার করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্যের অধীনে সেই শক্তিও দান করেন যার ফলে মানুষ তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর অবিচল থাকতে পারে।

এই বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "অতএব মানুষের জন্য এটি একটি প্রকৃতিগত প্রয়োজন ছিল, যে জন্য ইস্তেগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ- (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)। অতএব খোদা স্রষ্টাও এবং কাইয়্যুমও বটে, আর মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন খোদার স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু কাইয়্যুমিয়তের কাজ চিরকালের জন্য। (মানুষ জন্ম নেওয়ার পর খোদা তা'লার খালেকিয়্যত বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা পেয়েছে কিন্তু কাইয়্যুমিয়তের কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে।) এজন্যই চিরস্থায়ী ইস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়। (সবসময় এই কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্য লাভের জন্য অনবরত ইস্তেগফারে রত থাকা প্রয়োজন।) মোট কথা খোদা তা'লার প্রতিটি সিফত বা বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি কল্যাণ রয়েছে, আর ইস্তেগফার কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণ লাভ করার একটি মাধ্যম। ইস্তেগফার কাইয়্যুমিয়াত বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য। (আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্য থেকে যদি কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে ইস্তেগফার কর যেন আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, যে শক্তিসামর্থ্য দিয়েছেন, যে যোগ্যতা বা সামর্থ্য দান করেছেন সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী চালানোর তৌফিক দান করেন। তিনি বলেন, "সূরা ফাতেহার এই আয়াতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন' অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই এ কাজের সাহায্য প্রার্থনা করি যে, তোমার কাইয়্যুমিয়ত এবং রাবুবিয়্যত যেন আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করে এবং আমাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে। এমন যেন না হয় যে, দুর্বলতা প্রকাশ পায় আর আমরা ইবাদত করা থেকে বঞ্চিত থাকি।"

(আসমাতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১৮, পৃষ্ঠা: ৬৭২)

অতএব এটিই সেই মৌলিক বিষয় যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে থাকা চাই। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তাই যা ইচ্ছা কর, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিব, এমন কথা বলা সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমতকে সেসব লোকের ক্ষেত্রে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যারা তাঁর পানে আসে, যারা তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এরপর ইস্তেগফারের বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অনেক মানুষ এমন হয়ে থাকে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে, আবার অনেকে এমন আছে যারা পাপ কী তা জানেই না। (পাপ করে বসে কিন্তু অনুভবই করে না, চেতনাশূন্য হয়ে থাকে অথবা ভুলবশত পাপ করে বসে আর বুঝতেই পারে না যে, পাপ করেছে।) এজন্য আল্লাহ্ তা'লা সব সময়ের জন্য ইস্তেগফারকে আবশ্যক করেছেন যাতে মানুষ প্রত্যেক পাপের জন্য, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন, সে জানুক বা না জানুক, আর হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে সে যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। (শরীরের যত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে তার কোনটি দ্বারাই যেন এই ধরনের কোন পাপ সংঘঠিত না হয়, এর জন্য ইস্তেগফার করতে থাক।) তিনি বলেন, আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পাঠ করতে থাকা উচিত আর তা হচ্ছে رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا وَاِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ (সূরা আল আরাফ : ২৪) এই দোয়া শুরুতেই গৃহীত হয়েছে। (যার অর্থ হলো, হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম ও অন্যায় করেছি, এখন তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র না হও তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।) তিনি বলেন, "এই দোয়া প্রারম্ভেই গৃহীত হয়েছে, উদাসীনতায় জীবনযাপন করো না। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবনযাপন করে না তার ক্ষেত্রে কখনোই এই আশা করা যায় না যে, সে কোন নিদারুণ বিপদের মধ্যে নিপতিত হবে। ঐশী অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া এলহাম করা হয়েছে যে, "رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ-।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৫-২৭৬, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার হেফাযত লাভের জন্য, তাঁর সাহায্য ও সহায়তা লাভের জন্য, তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা, ইস্তেগফার এবং দোয়া করা আবশ্যক।

ইস্তেগফার এবং তওবা আমরা এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এ দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ইস্তেগফার এবং তওবা দুটি ভিন্ন জিনিস। একটি কারণে তওবার ওপর ইস্তেগফারের প্রাধান্য রয়েছে। (কেননা এটি প্রথমে এসেছে অর্থাৎ ইস্তেগফার তওবার পূর্বে এসেছে।) এছাড়া ইস্তেগফার হচ্ছে সাহায্য এবং শক্তি যা খোদা থেকে লাভ করা হয়। (অর্থাৎ পাপ থেকে বাঁচার জন্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সাহায্য এবং শক্তি লাভ করা হয় যাতে মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায়) আর তওবা হলো নিজের পায়ে দাঁড়ানো। (অর্থাৎ রক্ষা পাওয়ার পর অবিচলতার সাথে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর যে ইস্তেগফার করা হয়েছে, নিজের পাপ হতে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম তওবা। কাজেই এটি অর্থাৎ দোয়া ও তওবা এজন্য করা হয় যে, হে আল্লাহ্! ক্ষমা লাভের যে দোয়া আমরা করেছি আমাদেরকে তুমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ, আগুন থেকে যে মুক্তি দিয়েছো তা যেন এখন চিরস্থায়ী মুক্তি হয়। আমাদের কোন কাজ অথবা আমরা যে সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছি তা যেন কখনোই তোমাকে অসন্তুষ্ট না করে যাতে আমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে না যাই, এজন্য তওবা করা হয়। পাপ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য ইস্তেগফার করেছি আর 'ওয়া আতুবু ইলাইহে' বলার কারণ হলো তুমি যেন আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিতও রাখ, যাতে আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত থাকি এবং সর্বদা তোমার মাগফিরাত অর্জন করতে থাকি আর আগুন থেকে আমরা যেন সর্বদা মুক্তি পেতে থাকি।) তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট যে, যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে মানুষ সাহয্য প্রার্থনা করবে তখন খোদা তা'লা তাকে একটি শক্তি দান করবেন আর সেই শক্তি লাভের পর মানুষ নিজের পায়ে দণ্ডায়মান হবে এবং বিভিন্ন পুণ্য করার জন্য তার মাঝে এক শক্তি সঞ্চারিত হবে যার নাম হলো 'তুবু ইলাইহে'। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ ইস্তেগফারের পরেই তওবার তৌফিক লাভ করে। যদি ইস্তেগফার না করা হয় তাহলে নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো, তওবার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর তোমরা যদি এভাবে ইস্তেগফার কর আর পুনরায় তওবা কর তাহলে এর ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো- یُمَتِّعۡکُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی (সূরা হূদ: ৪) (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সর্বোত্তম উপকরণ প্রদান করবেন।) তিনি (আ.) বলেন, এভাবেই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বহমান রয়েছে। তোমরা যদি ইস্তেগফার এবং তওবা কর তাহলে নিজেদের পদমর্যাদা লাভ করবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি সীমা নির্ধারিত আছে যাতে সে উন্নতি করতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি নবী, রসূল, সিদ্দিক এবং শহীদ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত)

কিন্তু তার জন্য যতটুকু পদমর্যাদা নির্ধারিত আছে, যার জন্য যে সীমা নির্ধারিত, তা অর্জন করার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তা ইস্তেগফার এবং তওবার মাধ্যমেই করতে হবে।

তওবার আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট থাকে যে, আরবী অভিধানে প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলা হয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নামও 'তাওয়াব' রাখা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী, এর অর্থ হচ্ছে যখন মানুষ পাপ পরিত্যাগ করে খাঁটি হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি সমর্পিত হয় তখন খোদা তা'লা তার দিকে আরো দ্রুত গতিতে ছুটে আসেন আর এটি প্রকৃতির নিয়ম সম্মত একটি বিষয়। কেননা খোদা তা'লা যেহেতু মানুষের প্রকৃতিতে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যে, মানুষ যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে অন্য কোন মানুষের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন তার হৃদয়ও তার জন্য কোমল হয়ে যায়, তাহলে বিবেক এটি কীভাবে গ্রহণ করতে পারে যে, বান্দা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে আর খোদা তার দিকে মোটেও ফিরে তাকাবেন না। বরং খোদা সেই সত্তা যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু বলে সাব্যস্ত, তিনি বান্দার প্রতি অনেক বেশি প্রত্যাবর্তন করেন বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। একারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নাম 'তাওয়াব' রাখা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব বান্দার ফিরে আসা অনুশোচনা, অনুতাপ, বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে হয়ে থাকে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিপাত হয় বা প্রত্যাবর্তন হয় রহমত ও মাগফিরাতের সঙ্গে। খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের মাঝে যদি রহমত বা দয়া না থাকত তাহলে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারত না। তিনি বলেন, পরিতাপ! এসব মানুষ খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি এবং নিজেদের সব কিছুর ভিত্তি রেখেছে নিজেদের আমল এবং কর্মের ওপরে। (যারা মনে করে যে, নিজেদের কর্ম দ্বারাই আমরা সব কিছু অর্জন করব) কিন্তু সেই খোদা, যিনি কারো কোন কর্ম ছাড়াই হাজার হাজার নেয়ামত মানুষের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য কী এটি সমীচীন হতে পারে যে, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ যখন নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেন সে মরেই যায় আর পূর্বের অপবিত্র পোশাক নিজের শরীর থেকে খুলে ফেলে এবং তার ভালোবাসার অগ্নিতে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে তার পরেও খোদা তার প্রতি দয়ার সাথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না? এর নাম কি খোদার বিধান হতে পারে? " (চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা: ১৩৩-১৩৪)

তিনি (আ.) এখানে সেসব লোকদের উত্তর দিচ্ছেন যারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে প্রত্যাবর্তন করেন না। যদিও মানুষ দোয়া ও ইস্তেগফার করতে করতে নিজেদের অবস্থা মৃতবত করে ফেলে আর মনে হয় যেন তারা মরেই গেছে আর নিজেদের শরীরের পূর্ববর্তী অপবিত্র পোশাকও খুলে ফেলে, নিজেদেরকে পবিত্র করে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার আগুনে জ্বলতে আরম্ভ করে তবুও কি আল্লাহ্ তা'লা দয়ার সঙ্গে তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন না? এটি এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যারা মিথ্যা বলে, 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন'। তিনি (আ.) বলেন, এটি কখনোই হতে পারে না যে, বান্দা নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে আর খোদা তা'লা তাকে কিছুই দান করবেন না, এটি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার পরিপন্থী কথা এবং আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণার পরিপন্থী যে, আমার রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি তাঁর বিধান পরিপন্থী। আমি যেমনটি বলেছি, এটি তাঁর রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার পরিপন্থী কথা। কিন্তু মানুষকে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা-ও এভাবে যে, সে যেন এক মৃত্যু বরণ করেছে আর তার পূর্ববর্তী পাপের অপবিত্র পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসার আগুনে দগ্ধ হতে হবে। এই কথাটি গভীর মনোযোগের দাবি রাখে, তিনি বলেন, যদি এমনটি করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করেন বা মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, মানুষ তা ভাবতেও পারে না।

অতএব এই হলো ক্ষমা প্রার্থনা করার সেই মান যা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'লার রহমতের অধিকারী করে, সেই অধিকার, যা প্রদান করা আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। তিনি (আ.) সত্যিকার এবং যথাযথ তওবার বিভিন্ন শর্তের কথাও উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এটি অর্জনের জন্য মানুষকে কীরূপ এবং কীভাবে চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার তওবা করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে নিজের মন-মস্তিষ্ককে সেসব বিষয় থেকে পবিত্র করা যার ফলে নৈরাজ্যপূর্ণ চিন্তাধারা সৃষ্টি হতে পারে। আর এটি ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব মন্দের এক ভয়ানক এবং বিভীষিকাময় চিত্র তোমাদের মস্তিষ্কে সৃষ্টি না হবে। যদি এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, এ সম্পর্কে যদি তোমাদের মাথায় এক ঘৃণ্য চিত্র অংকন না কর তাহলে এগুলো থেকে বিরত থাকা অনেক কঠিন। প্রথম শর্ত হলো এসব বিষয় নিজেদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। চেষ্টা প্রচেষ্টা করে এগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত কোন মন্দ কাজ বা ভুল কাজের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর অনুতাপ ও অনুশোচনা করা প্রয়োজন। মানব হৃদয়ে যখন এই ধারণা জাগে তাৎক্ষণিভাবে তার লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া চাই। হৃদয়ে যেন এই চেতনা সৃষ্টি হয় যে, মন্দের যে আকর্ষণে আমি ছুটছি, তা সাময়িক এবং এগুলো আমার জীবনকে ধ্বংস করে ছাড়বে আর এক সময় এসে এগুলো শেষ হয়ে যাবে। এগুলো সাময়িক সুখভোগ মাত্র। তাই নিজের বিবেকের কথা শুনতে হবে। মানুষের বিবেক তাকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করে যে, এটি মন্দ জিনিস আর এটি ভালো জিনিস। এ ধরনের চিন্তাভাবনা যখন আপনাদের মাঝে জাগ্রত হবে আর যখন বিবেকের ডাকে সাড়া দিবেন তখন ধীরে ধীরে পাপ থেকেও আপনারা মুক্তি লাভ করতে পারবেন। আর তৃতীয়ত আপনাদের মাঝে যেন দৃঢ় সংকল্প থাকে যে, আমি এসব মন্দের ধারে কাছেও ঘেঁষবো না। অতঃপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় সংকল্প যদি থাকে আর দোয়াও যদি করা হয় তবেই সকল মন্দ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে আর বিভিন্ন পুণ্য সেই জায়গা দখল করতে আরম্ভ করবে। তিনি (আ.) যে বলেছেন, অপবিত্রতার পোশাক পরিত্যাগ করতে হবে- এর অর্থ এটিই যে, পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা সাধনা কর আর এর ওপর দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাক তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দয়ার যোগ্য হবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত)

ইস্তেগফার এবং তওবার মাধ্যমে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "তওবা মানুষের জন্য কোন অতিরিক্ত বা অকল্যাণকর বিষয় নয় আর এর প্রভাব শুধু কেয়ামতের জন্যই সীমিত নয় বরং এর ফলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টোই নিশ্চিত হয় আর সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। দেখ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২) অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ এবং সুখ শান্তির উপকরণ দান কর এবং পরজগতেও সুখ শান্তির উপকরণ দান কর, আর আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। দেখ! সত্যিকার অর্থে 'রাব্বানা' শব্দটিতে তওবার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা 'রাব্বানা' শব্দটি দাবি করে যে, সে অন্যান্য যেসব প্রভু পূর্বে বানিয়ে রেখেছিল, তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে প্রকৃত প্রভুর দিকে যেন ফিরে আসে। আর এই শব্দটি সত্যিকার বেদনা এবং পরম বিনয় ছাড়া মানুষের হৃদয় থেকে উত্থিত হতেই পারে না। (মানুষ যখন 'রাব্বানা' বলে, তখন সে শুধুমাত্র মুখ দ্বারাই বলে না, বরং হৃদয় থেকে এই দোয়া উদ্ভূত হয়। 'রাব্বানা' তখনই বলবে, যখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হবে। অনেকে বাহ্যিকভাবেও 'রাব্বানা' বলে থাকে, কিন্তু এই দোয়ার আসল মর্ম সেটি, যখন তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়।) তিনি বলেন, 'রব' তাকে বলা হয় ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দানকারী এবং প্রতিপালনকারীকে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের হৃদয়ে অনেক কল্পিত প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অনেকে নিজদের ছল-কপটতার ওপর আস্থা রাখে, যেন এটিই তার প্রভু, কারো যদি নিজের জ্ঞান অথবা শক্তির বড়াই থাকে তাহলে সেটিই তার প্রভু, কারো যদি সৌন্দর্য বা ধন-সম্পদের গরিমা থাকে তাহলে সেটিই তার 'রব' বা প্রভু। মোটকথা এ ধরনের শতসহস্র উপকরণ তার সঙ্গে লেগে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সবগুলোকে পরিত্যাগ করে এদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এক-অদ্বিতীয় এবং সত্যিকার খোদার সমীপে নতশির না হয় আর বিগলিত চিত্তের 'রাব্বানা' ধ্বনি তাঁর দরবারে সমর্পিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার 'রব'কে সে চিনে নি। অতএব এইরূপ বিগলিত হৃদয়ে আর উচ্ছ্বসিত প্রাণে যখন নিজের পাপ স্বীকার করে তওবা করে এবং নিজ প্রভুকে সম্বোধন করে বলে 'রাব্বানা' অর্থাৎ সত্যিকার এবং প্রকৃত উপাস্য তুমিই ছিলে কিন্তু আমরা ভুলক্রমে অন্যত্র দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখন আমি সেইসব মিথ্যা প্রতিমা এবং মিথ্যা উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং খাঁটি হৃদয়ে আর নিষ্ঠার সাথে তোমার প্রতিপালক হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে ফিরে আসছি। মোটকথা এগুলো ছাড়া খোদাকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। মানুষের হৃদয় থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য কল্পিত 'রব' এবং তাদের মূল্য, মাহাত্ম্য, সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব বেরিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার 'রব' এবং তাঁর প্রতিপালক হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ

করতে পারে না। অনেকে মিথ্যাকেই নিজেদের প্রভু বানিয়ে রেখেছে। তারা মনে করে যে, মিথ্যা ছাড়া আমাদের জীবনযাপন করা কঠিন। অনেকে চুরি, ডাকাতি এবং প্রতারণাকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে রেখেছে। তাদের বিশ্বাস, এগুলো ছাড়া নিজেদের জীবন-জীবিকার আর কোন পথ খোলা নেই। অতএব তাদের প্রভু প্রতিপালক হচ্ছে সেসব জিনিস। তিনি বলেন, এমন মানুষ, যারা নিজেদের প্রতারণা এবং শঠতার ওপর বিশ্বাস রাখে, খোদা তা'লার কাছে তাদের সাহায্য প্রার্থনা এবং দোয়া করার প্রয়োজনই বা কী? দোয়ার প্রয়োজন তো তারই হয়ে থাকে, যার সকল পথ বন্ধ আর এই দ্বার ছাড়া অন্য কোন দ্বার খোলা থাকে না, তার হৃদয় থেকেই 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া'র দোয়া উদ্ভূত হয়। এমনভাবে দোয়া করা শুধু সেইসব লোকের কাজ যারা কেবলমাত্র খোদাকেই নিজেদের প্রভু প্রতিপালক মনে করে আর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদের প্রভুর সামনে অন্য সব প্রভু মিথ্যা ও তুচ্ছ। তিনি বলেন, আগুন বলতে সেই শুধু সেই আগুনকেই বোঝানো হয় নি যা কিয়ামত দিবসে প্রকাশ পাবে বরং এই পৃথিবীতেও যখন একজন মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে, সে দেখতে পায় যে, পৃথিবীতে হাজার ধরনের আগুন রয়েছে। অভিজ্ঞ লোকেরা জানে যে, বিভিন্ন ধরনের আগুন পৃথিবীতে বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকার শাস্তি, ভয়-ভীতি, হত্যা, দারিদ্র তা, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা,গঞ্জনা ও দু র্যোগ, হাজার প্রকার দুঃখ, কষ্ট, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন কষ্ট, আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোটকথা এগুলো সবই আগুন। অতএব মু'মিন দোয়া করে যে, সকল প্রকার আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমরা যখন তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তখন সেই সব দুঃখ-বেদনা, যা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলে আর মানুষের জন্য যা আগুন সদৃশ্য তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৭-১৯০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার জামা'তকে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন যে, আমাদের জামা'তকে অধিক সংখ্যায় এই দোয়া পাঠ করা উচিত যে, رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত)

অতএব, আমাদেরও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত রাখেন এবং সব ধরনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আগুন থেকে নিরাপদ রাখেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা যে এ কথা বলেছেন, এর সারাংশ হলো- হে আমার বান্দাগণ! আমার বিষয়ে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আমি রহীম, করীম, সাত্তার এবং গফুর আর সবচেয়ে বেশি তোমাদের প্রতি দয়ালু। এতবেশি দয়া তোমাদের প্রতি আর কেউ করবে না, যতটা আমি করে থাকি। তোমরা আমাকে নিজ পিতার চেয়েও অধিক ভালোবাস, কেননা সত্যিকার অর্থে আমিই ভালোবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য। তোমরা যদি আমার পানে আস, তাহলে আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিব আর তোমরা যদি তওবা ও অনুশোচনা কর, তাহলে তা আমি গ্রহণ করব। আর যদি তোমরা আমার কাছে ধীর গতিতে আস, তাহলে আমি তোমাদের কাছে ছুটে আসব। যে ব্যক্তি আমাকে সন্ধান করবে, সে আমাকে লাভ করবে আর যে আমার প্রতি সমর্পিত হবে, সে আমার দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পাবে। আমি তওবাকারীদের পাপ ক্ষমা করে দিই, তাদের পূর্বের পাপ পাহাড়তুল্যই হোক না কেন। আমার দয়া তোমাদের প্রতি অনেক বেশি এবং আমার শাস্তি অনেক কম, কেননা তোমরা আমার সৃষ্টি, আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তাই আমার দয়া তোমাদের সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা: ৫৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার পানে যাওয়ার তৌফিক দিন। আমরা যেন তাঁর তাক্বওয়া অর্জনকারী হই, নিজেদের ঈমান এবং বিশ্বাসে অগ্রসর হই, যাতে সর্বদা তাঁর দয়া থেকে আমরা অংশ লাভ করতে থাকি। আমরা তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হই- কখনও যেন এমন সময় না আসে, আমাদের অপকর্মের কারণে আমরা যেন তাঁর শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত না হই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি যেন সর্বদা আমাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে।

اِحۡفَظۡ لِسَانَکَ

(তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত (রক্ষা কর) রাখ)
মিথ্যারোপ, মিথ্যা, পরচর্চা, পর-নিন্দা, ঝগড়া, কলহের বিষয় থেকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক।

-হাদীস

১ম খুতবার শেষাংশ..

ফাসলুল খাস ক্লাসে ভর্তি হন আর ১৯৮৮ সনের ১লা মার্চ তিনি শিক্ষালাভ শেষ করেন। জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা জীবনের প্রেক্ষিতে তখন জামেয়ার প্রিন্সিপাল সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব নিজের মন্তব্যে তার সম্পর্কে লিখেন যে, মেধাগত দিক থেকে কিছুটা দুর্বল কিন্তু অনেক সাহায্যকারী এবং আনুগত্যকারী ছাত্র ছিলেন। নম্র স্বভাবের এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। বুযুর্গদের সাথে দেখা করা এবং তাদেরকে দোয়ার জন্য বলাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কে পাকিস্তান থেকে হিজরত করতে হয়, তখন এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে ডিউটি প্রদানকারীদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমান প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়্যায সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আমরা জামেয়াতে একত্রে পড়াশোনা করেছি। অনেক পুণ্যবান ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। জামেয়াতে তাকে সেইসব ছাত্রের মাঝে গণনা করা হতো যাদের মাঝে ইবাদত এবং সাধনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুগত্য তার বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, নকীব এবং যয়ীম হওয়ার কারণে তার সাথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমার কাজ করতে হয়েছে, তখন তাকে অনেক বিনয়ী এবং নির্দেশ পালনকারী ও আনু গত্যকারী পেয়েছি। ফুটবলের অনেক শখ ছিল তার। দলে তিনিই একমাত্র সদস্য ছিলেন, যাকে বিশেষভাবে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। জামেয়ার পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৮৮ সনে উগান্ডায় মুবাল্লেগ হিসেবে রীতিমত তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি বিভিন্ন জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেন। ২০০৭ সনে উগান্ডার আরো দুই জন মুবাল্লেগের সাথে তিনি পাকিস্তানে যান, সেখানে তিনি উগান্ডার ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদের কাজ রিভাইজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিন মাসের মাঝে তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেন। জামেয়াতে অধ্যয়নকালে জ্ঞান বা মেধাগত দিক থেকে হয়ত বা দুর্বল ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানের দিক থেকেও অনেক উন্নতি করেছিলেন। নিজের জ্ঞানকে বৃ দ্ধি করেছিলেন। তার মাঝে তবলীগের অনেক আগ্রহ ছিল এবং তার তবলীগে বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সাইকেলে করেই অনেক দীর্ঘ তবলীগি সফর করতেন। এক তবলীগের সফরে থাকাকালে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় কিন্তু তার সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিল না। তিনি যখন তবলীগি সফর থেকে ফিরে আসেন তখন জানতে পারেন যে, স্ত্রী মারা গেছেন এবং তার দাফন কাফনও হয়ে গেছে। অত্যন্ত সরলতার সাথে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থেকে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। অনেক কোমল হৃদয়, সহানুভূতিশীল এবং মহানুভব মানুষ ছিলেন। গরীব এবং মিসকীনদের অনেক খেয়াল রাখতেন। খেলাফতের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। খলীফার সকল নির্দেশ মান্য করাকে আবশ্যক মনে করতেন। আফ্রিকান মুবাল্লেগ, বিশেষ করে ওয়াকফে জিন্দেগীদের মাঝে আমি দেখেছি যে, প্রায় সকল আফ্রিকানদেরই খেলাফতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

উগান্ডার আমীর মোহাম্মদ আলী কাইরে সাহেব লিখেন, মরহুম একজন উৎকৃষ্টমানের মুরব্বী, অত্যন্ত নেক হৃদয়ের অধিকারী, তবলীগে আগ্রহী এবং ধর্মের সেবক ছিলেন। অনেক সমস্যাবলী থাকা সত্ত্বেও কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সেবায় রত ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন আর কিছুকাল পর তৃতীয় বিয়ে করেন। তার এক স্ত্রী লিখেন, আমি তাকে সারা জীবন অনেক স্নেহশীল, নম্র হৃদয় এবং সকল অবস্থায় শান্ত ও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ দেখেছি। তার কন্যা লিখেন, আমাদের পিতা অনেক মহানুভব এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সর্বদা আমাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নসীহত করতেন। মরহুম তার পেছনে দুই স্ত্রী এবং নয় জন সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি রহম করুন, তার সাথে মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন এবং তার বংশধরদেরকেও সর্বদা আহমদীয়াত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

*****❖*****❖*****❖*****

ইমামের বাণী

"তাকওয়া এমন এক মূল, যা না থাকলে সবই বৃথা এবং এটা বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে।"

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

হযরত ইমাম মাহদির (আ.) অপেক্ষায়

মাহমুদ আহমদ

মুসলিম জাহান আজ শত দলে বিভক্ত। প্রিয় নবী (সা.)-এর অন্তর্ধানের পর মুসলমানদের মধ্যে ঐশী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই এই খেলাফত ব্যবস্থার সমাপ্তি হয়ে জুলুম-অত্যাচারের রাজত্বের পর পুনরায় পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসার কথা ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমণের মাধ্যমে। অনেকেই মনে করেন, আমরা নামায, রোযা, হজ, যাকাত সবই পালন করছি ও মানছি তাহলে আবার ইমাম মাহদী আসার কি প্রয়োজন আছে? আবার উম্মতের বেশিরভাব তাঁর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনছেন? ইতিমধ্যে অনেক পীর, মাওলানা ইমাম মাহদীর আগমণের দিন-তারিখও উল্লেখ করে গেছেন। এছাড়া তাঁর আগমণের বিষয়ে মহানবী ও (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখন প্রশ্ন হল তিনি কখন আসবেন?

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর সন্নিহিতরা, তারপর সন্নিহিতরা, অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে' (নেসাই ও মেশকাত)। মহানবী (সা.)-এর সোনালী যুগ তিনশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে এক হাজার বছর পর ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা। অন্য একটি হাদিসে ইমাম মাহদীর আগমণের নিদর্শনগুলো প্রকাশের কথা আরও কিছু আগে শুরু হবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সেই লক্ষণগুলো দুইশ বছর পর দেখা দিবে, যা হাজার বছর পর আসবে'(মেশকাত)। এই হাদীসে সমর্থনে আল্লামা হযরত মোল্লা আলি কারী (রহ.) মেশকাত শরিফের শরাহ মিরকাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন 'সেই দুইশ বছর পর, যা হাজার বছর পর আসবে, তখনই ইমাম মাহদীর (আ.) জাহির হওয়ার সময়; (মিরকাহ, শরহে মেশকাত)। মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলামের প্রথম তিনশ বছর ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম যুগ। অতঃপর যদিও ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ বা ধমং সংস্কারক আবির্ভুত হতে থাকবেন তার পরও পরবর্তী এক হাজার বছরে শরিয়ত আল্লাহ্‌র দিকে উঠে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহানবীর (সা.) তিনশ বছরের পর চতুর্থ শতাব্দী থেকে ক্রমাবনতির ধারায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসলাম আল্লাহ্‌র দিকে উঠে যাবে আর পৃথিবীতে ইসলাম শুধু নামে থাকবে, ইসলামের চরম অধঃপতন ঘটবে। ইসলামের এই অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদীকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই পাঠাবেন।

বিষয়টি স্পষ্ট, হযরত ইমাম মাহদীর আগমণ হওয়ার কথা ১২০০ হিজরী সনের পর। কিন্তু ১২০০ হিজরী পার হয়ে বর্তমান ১৫০০ হিজরী শতাব্দী চলছে। ইমাম মাহদীর আগমণ যদি এখনো না হয়ে থাকে তাহলে তার আসার সময় কখন? এবার দেখা যাক তার আবির্ভাব সম্পর্কে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও আলেম সাহেবানরা কি মত পেশ করেছেন। আলহাজ মওলানা একেএম ফজলুর রহমান মুন্সী রচিত 'পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (র.) যা ১৯৮৪ সালে দ্যা তাজ পাবলিশিং হাউস, কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর একাংশে ইমাম মাহদির আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে উল্লেখ করেন-' এই উপমহাদেশের বিখ্যাত অলি হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ্ কাশ্মীরী (র.) তাহার ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেছেন, ১৩৯০ হিজরী সনে ইমাম মাহদী জন্ম গ্রহণ করবেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করেবেন। এই হিসাব অনুসারে ইমাম মাহদী ১৪২০ সনে আত্মপ্রকাশ করবেন। সুতরাং তার প্রকাশ পাওয়া মাত্র বিশ বছর বাকি রয়েছে।' (পৃষ্ঠা: ১৬-১৭) এই অনুযায়ী ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হওয়ার কথা ২০০৪ সালে। কারণ ১৯৮৪ সালে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, আর মাত্র বিশ বছর বাকি আছে ইমাম মাহদীর আগমণের সময়। তাহলে বর্তমান কত সাল চলছে?

মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত (হিজরী ১৩০৫) হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানি প্রণীত কিতাবব 'আল-ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১৬০ পৃষ্ঠায় তিনি এ মত প্রকাশ করেছেন, মাহদি (আ.) ১২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করবেন। দ্বাদশ হিজরীরর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) তার মূল্যবান কিতাব 'তাফহিমাতে ইলাহিয়াত' প্রকাশ ১৩৫৫ হিজরী। ওই গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'মহাপ্রতাশালী আমার প্রভু আমাকে জানিয়েছেন যে, কেয়ামত অতি নিকটবর্তী এবং হযরত মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ' মৌলভী নবা সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেজাজুল কেরামাহ ফি আসারে কাদীমা' গ্রন্থে তিনি ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনা করেছেন এবং বহু গণ্যমান আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ মন্তব্য এভাবে বর্ণনা করেছেন-' আমি বড় মজবুত সূত্রগুলো মিলিয়ে দেখছি যে, নিশ্চয় তিনি (ইমাম মাহদী) হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভুত হবেন। (পৃষ্ঠা-৩৯৫)

পাক ভারতের খ্যাতনামা আলেম সৈয়দ আব্দুল হাই (রহ.) তার লিখিত পুস্তক ' হাদিসুল গাসিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন- 'চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব অনেকটা সুনিশ্চিত। যেহেতু মাহদী (আ.) সম্পর্কিত সব নিদর্শাবলি প্রকাশ হয়ে গেছে।' খাজা হাসান নিজামী পাক ভারতের বিখ্যাত সুফি ও সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনি ইমাম মাহদীর আগমণ সম্পর্কে 'কিতাবুল আমর ইয়ানি মাহদীর আনসার ও ফারায়েয' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ওই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন-'মাহদী (আ.)-এর যুগ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী।' তাছাড়া তিনি একবার আরব দেশ ভ্রমণ করে লিখেছেন -'আরবের মাশায়েখ ও উলেমায়ে কেরাম সবাই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অপেক্ষা করছেন। এমনকি শেখ সানসির এক খলীফা এত দূর বলে ফেললেন যে, হিজরী ১৩০০-এ মাহদী (আ.) জাহির হয়ে পড়বেন। (পত্রিকা 'আহলে হাদীস' , ২৬ জানুয়ারী, ১৯১২)

ইমাম মাহদী (আ.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে বিশ্বমানবের কাছে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি নতুন কোন শরিয়ত নিয়ে আসবেন না, কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং মহানবী (সা.) শেষ শরীয়তদাতা নবী, তাঁর পর আর কেউই নতুন শরিয়ত নিয়ে দুনিয়ায় আগমণ করবে না। ইমাম মাহদী (আ.) এসে মহানবী (সা.) কাজই পরিচালনা করবেন। ধর্মে যে সব বেদাত সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করবেন। তিনি ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। তাই ইমাম মাহদী (আ.)-কে সাহায্য করা ও তার আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যিক কর্তব্য বলে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি (সা.) বলেছেন, ' প্রত্যেক মুসলমানের উপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হবে ইমাম মাহদীর সাহায্য করা অথবা তার ডাকে সাড়া দেওয়া। ' (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)। তাই আমাদের কর্তব্য হবে ধর্ম সংস্কারের জন্য শেষ যুগে যার আসার কথা তিনি এসেছেন কিনা তা অন্বেষণ করা।

প্রথম পাতার শেষাংশ.....

ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কতই সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না। আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। সারা বিশ্বের খোদা তিনি-ই, যিনি আমার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন, আমার স্বপক্ষে মহানিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নাই, না আকাশে, না পৃথিবীতে। যে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং হতাশা ও দুঃখে আক্রান্ত। আমি আমার খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি সমস্ত বিশ্বের খোদা এবং তিনি ছাড়া সআর কেহই নাই। কিরূপ সর্বশক্তিমান ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা যাহাকে আমি লাভ করিয়াছি! কি মহাশক্তির অধিকারী সেই খোদা যাহাকে আমি দর্শন করিয়াছি! সত্য ইহাই যে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্ত কেতাব ও প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ নেচারী বা নাস্তিকদের মত হইও না যাহারা খেয়ালের বশে এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, যাহার প্রতি খোদাতালার কেতাবের কোন সমর্থন নাই। কেননা, তাহারা বিতাড়িত ও প্রত্যাখ্যাত। তাহাদের দোয়া কখনও কবুল হইবে না। তাহারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে, তাহারা মৃত, জীবিত নহে। তাহারা খোদার সম্মুখে নিজেদের রচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁহার অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে এবং তাঁহাকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দন্ডায়মান হও, তখন তোমাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সকল বিষয়েই শক্তিমান। তবেই তোমার দোয়া কবুল হইবে এবং তুমি খোদাতালার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি সত্য সত্যই এই সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নহে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৮-২১)

২ পাতার পর...

ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে সকল প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং পাপ দূর করার উপদেশ দেয়। তিনি ভালবাসা ও পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের পতাকাতলে সকলকে একতিত্র হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, " পারস্পরিক বিভেদ পৃথিবীতে অশান্তির আগুন লাগানোর কাজ করে চলেছে আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এক ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কার মেঘ ক্রমশ ঘনীভুত হচ্ছে। চোখের সামনেই বিভিন্ন জোট এবং দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে। আমি এ বিষয়ে আশঙ্কিত যে, প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট না করেই আমরা আরও এক বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, যদি বলা হয় যে যুদ্ধের লক্ষণাবলী এখন থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে তবে ভুল বলা হবে না। তিনি একথার উপর জোর দেন যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারি।

শরণার্থীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইউরোপে অভিবাসীদের জনপ্লাবনের বিষয়টিও আলোচ্য। খলীফা বলেন, কোন দেশই লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর স্থান সংকুলান করতে সক্ষম নয়। তিনি বলেন, এর সমাধান একটিই, আর তা হল অভিবাসীদের নিজেদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোন উপায় বের করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের দেশে অন্যায় অত্যাচার প্রতিহত করা যায়। তিনি রাজনীতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তারা যেন শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ হাতছাড়া না করেন। খলীফা এবং ১৫০ জন অতিথির নৈশভোজের পূর্বে হলঘরে দোয়া করা হয়। এরপর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ জামাতের পক্ষ থেকে সেই একই সম্মানের সঙ্গে হলঘর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন যেভাবে তিনি এসেছিলেন।

১২ই মে, ২০১৬

মসজিদ মাহমুদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ

* আজ সুইডিশ টেলিভিশন 'স্কীন টিভি' 'নতুন মসজিদে পবিত্র পদধূলি' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে লেখা হয়: মালমোতে নতুন মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। এর সম্পূর্ণ নির্মাণ খরচ আহমদীয়া সম্প্রদায় বহন করেছে যারা যাবতীয় প্রকারের উগ্রবাদের নিন্দা করে। আমাদের মোটো, ' ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে;' একথা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব বলেছেন যিনি জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ নেতা। বর্তমানে তিনি মালমোতে মসজিদ উদ্বোধনের জন্য এসেছেন।

অনেকে হয়তো মসজিদটি পাশের মোটরওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময়ই দেখেছেন।

এই মসজিদের নাম ' মসজিদ মাহমুদ' যা জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফার নামে রাখা হয়েছে। বুধবার দিন মিডিয়ার জন্য মসজিদের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ওয়াসীম আহমদ সাজেদ যিনি লোলিও শহর থেকে এখানে এসেছেন তিনি বলেন, এখানে আসা অনেক বড় বিষয় আর এটি আমার জন্য সম্মানের কারণ।

এক সুইডিশ যুবতী ফারিদা নিলসনও নিজের আধ্যাত্মিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লোলিও থেকে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করা। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের মূহুর্ত, যদিও আমি লন্ডনে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছি।

মালমো জামাতের সদস্য সংখ্যা ৩০০। সুইডেনে তাদের সংখ্যা এক হাজার এবং সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ। জামাত আহমদীয়া একটি সুন্নী সম্প্রদায় যার গোড়াপত্তন হয় পাঞ্জাবে। কিছু মুসলমানদের কাছে এই সম্প্রদায় বিতর্কিত, কেননা নবুয়ত সম্পর্কে এদের মতবিশ্বাস এবং ব্যাখ্যা ভিন্ন। অনেক দেশে জামাতের বিরোধীতা হয়। পাকিস্তানে তাদের নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার অনুমতি নেই। এই মসজিদটি এই দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম আহমদীয়া মসজিদ।

খলীফাতুল মসীহ মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব বলেন, এই ভবনটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। আমি আশা করি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা দ্বারা এটি সমাদৃত হবে।

মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা। জামাত আহমীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ভালবাসা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই জামাত যাবতীয় প্রকারের সন্ত্রাসের ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। এই মসজিদে সকলেই স্বাগত, সকলের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আযানের ধ্বনি স্পীকারের মাধ্যমে মসজিদের মধ্যেই অনুরনিত হয়। এখানে একটি স্পোর্টস হল এবং মিটিং হলও রয়েছে। মসজিদের যাবতীয় খরচ জামাত আহমদীয়া নিজেই বহন করেছে।

অনলাইন পত্রিকা মালমো-২৪ (আর্বিদ নিক্কা) নিম্নোক্ত শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

" মুসলমান পোপ" মসজিদের উদ্বোধন করছেন। " বড়ি শখসিয়াত" পত্রিকা লেখে: নির্মাণের জন্য অনুমতি পাওয়ার ষোল বছর পর এখন মালমোর এলিসেডাল অঞ্চলে অবস্থিত নতুন মসজিদ মাহমুদের উদ্বোধন হচ্ছে। জুমার দিনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব-নেতা স্বয়ং অংশ গ্রহণ করছেন। ৬৫ বছর বয়সী হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব বিশ্ব-আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বোচ্চ নেতা এবং আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। জামাত আহমদীয়া ইসলামের একটি সম্প্রদায় যার সদস্য সংখ্যা এক কোটি। এরপূর্বে তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক প্রতিষ্ঠানেও ভাষণ দান করেছেন। এখন তিনি মালমো আসছেন। তাঁর আগমণ ঘটবে মাহমুদ মসজিদ উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মূহুর্তে।

খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৩ সালে খলীফা হওয়ার পর থেকে তিনি সারা পৃথিবী সফর করে শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রসার করেছেন। একথা বলেছেন স্টকহোম জামাতের ইমাম কাশিফ ওয়ার্ক সাহেব।

মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব সর্বত্র উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁর মতে সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে হলে পুলিসের ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

মার্কিন পত্রিকা 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' তাঁকে 'মুসলমান পোপ' নামে অভিহিত করেছে, সেই বিশিষ্ট মর্যাদার কারণে যা জামাত আহমদীয়ায় তাঁর রয়েছে। জামাত আহমদীয়া সুইডেনের কাছে, যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার, এই নতুন মসজিদটি একটি বিরাট সফলতার মত। এর নির্মাণ খরচ জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা বহন করেছেন। এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ২০০০ সালে। নির্মাণকালে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

Sydsvenskan পত্রিকা নিম্নরূপ শিরোনাম সহকারে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করেছে।

সদ্য নির্মিত মসজিদ পরিদর্শনের জন্য খলীফার মালমো আগমণ। শনিবারে জামাত আহমদীয়ার নতুন মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। এর নির্মাণ কাজ নিরীক্ষণ করবেন খলীফা মসরূর আহমদ সাহেব স্বয়ং। ২৪ উচ্চ ভবনের মোট নির্মাণ খরচ হয়েছে ৪কোটি ৯ লক্ষ ক্রোনার। এর সমস্ত খরচ জামাত আহমদীয়া সুইডেনের সদস্যরা বহন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে শনিবার। মঙ্গলবার জামাতের সর্বোচ্চ নেতা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব মালমো এসেছিলেন।

মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব বলেন, যখন আমি প্রথমবার এখানে এসেছিলাম তখন এখানে একটি ফাঁকা মাঠ ছিল। কালকে এসে দেখি এখানে একটি সুন্দর বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে মানুষ ইবাদতের জন্য একত্রিত হয় এমন এক স্থান দেখার সুযোগ পাওয়া একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হয়ে থাকে।

জামাত আহমদীয়া নিজেকে একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু মহিলা এবং সমকামিদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের থেকে ভিন্ন। খলীফার সঙ্গে নেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার জুমার দিন প্রকাশিত হবে।

১৩ই মে, ২০১৬

কালমারের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানে একাধিক কমিটির সদস্য পদে থাকা ৩০৫ কিমি সফর করে আসা রজার কালিফ সাহেব মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন।

ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত সাক্ষাত করেন। এরপর তিনি ফিরে যান।

অনলাইন পত্রিকা মালমো ২৪-তে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার

*সর্বপ্রথম সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান এবং হুযুরকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন পর্যন্ত মালমো সফর কেমন কেটেছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: গত তিন দিন থেকে এই সফর আমি উপভোগ করছি। এই স্থানটি খুবই সুন্দর এবং খোলামেলা। নির্মল বাতাস থেকে লাভবান হচ্ছি। এখানে আমি জামাতের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করছি। তারা খুবই আনন্দিত, তাদের সাথে আমিও আনন্দিত।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আপনি কি এই প্রথমবার মালমো আসছেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: না, এখানে পূর্বেও আমি এসেছিলাম। সম্ভবতঃ ২০০৫ সালে এখানে এসেছিলাম। সেই সময় আমরা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশের জলসার আয়োজন এখানে গোথানবার্গে করেছিলাম।

সাংবাদিক বলেন: আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপনার কেমন লেগেছে?

হুযুর বলেন: খুব ভাল দিন ছিল। সুইডেন ছাড়া অন্যান্য দেশের অতিথিদের আসার বিষয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম না। এখানে জুমার নামাযে স্থানীয় আহমদীদের তুলনায় বহিরাগত আহমদীর সংখ্যা বেশি ছিল।

এরপর সাংবাদিক বলেন, এখানে আপনাদের বেশ বড় মসজিদ তৈরী হল, অথচ মালমোতে জামাত আহমদীয়ার সদস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তাহলে আপনি এই সুন্দর মসজিদটিকে কিভাবে পূর্ণ করবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার মৃদু হেসে বলেন: যদি আপনাদের মত উদারমনা মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে আমাদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

সাংবাদিক পরের প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আপনার মতে জামাতের জন্য এই মসজিদ নির্মাণ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

হুযুর বলেন: আমি খুতবায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে, কেবল মালমোতেই নয়, বরং যেখানেই আমাদের জামাত থাকে আর আমাদের উপায় উপকরণ থাকে আর যদি সেখানকার স্থানীয় জামাত নির্মাণের ইচ্ছা রাখে এবং স্থানীয়রা এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে তবে এমন স্থানে অবশ্যই মসজিদ নির্মাণ করি। এখন লোলিও জামাত যদি এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে চায় তবে আমরা সেখানেও যাব আর যদি অন্যত্রও মসজিদ নির্মাণ করতে হয় তবে সেখানেও আমরা যাব। হুযুর বলেন: আমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় আর আমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার উপর অনুশীলন করার পূর্ণ চেষ্টা করি। আমাদের মতবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের মূল উদ্দেশ্য হল নিজের স্রষ্টার উপাসনা করা। তাই একস্থানে একত্রে ইবাদত করতে গেলে একটি জায়গারও প্রয়োজন হয়, সেই জায়গা ছোট একটি মসজিদ হোক বা বড় কোন মসজিদ। তাই যেখানেই আমাদের জামাত রয়েছে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি। জার্মানীতে আমাদের কয়েক ডজন মসজিদ আছে, এছাড়া আরও মসজিদ আমরা সেখানে নির্মাণ করছি।

এরপর সাংবাদিক বলেন, জামাত আহমদীয়া এবং অন্যান্য মুসলমি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যা প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করে। ইসলামের পয়গম্বার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসবে। সেই সময় মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পথ-প্রদর্শন লাভ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের এও বিশ্বাস, যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন তিনি নবী হবেন আর তাঁকে স্বয়ং রসুল করীম (সা.) নবী নামে অভিহিত করেছেন। এটিই মূল পার্থক্য যা আহমদীয়া জামাত এবং অন্যান্য জামাতের মধ্যে সংঘাতের কারণ হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের দাবি হল, এমন ব্যক্তির আবির্ভাব এখন ঘটবে আর তারা বলে, যে মসীহর আগমণের কথা তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু আমরা বলি মসীহ খোদার নবী ছিলেন যিনি পৃথিবীতে ১২০ বছর জীবিত ছিলেন অতঃপর তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আকাশে কোন ব্যক্তি দুই হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, মসীহ (আ.) অত্যন্ত খোদাভীরু মানুষ এবং খোদার নবী ছিলেন যিনি খোদার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন। আর অন্যান্য মুসলমানেরা বলে, মসীহ (আ.) আকাশে জীবিত আছেন এবং কোন এক সময় তিনি নেমে আসবেন। খৃষ্টানদেরও এই একই বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, নবী করীম (সা.) এবং কুরআন করীমের পক্ষ থেকে তাঁর আগমণের বিষয়ে যে লক্ষণাবলীর কথা বলা হয়েছে সেগুলি সবই পূর্ণ হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও প্রাচুর্য হবে। যেরূপ আমরা বর্তমান যুগে লক্ষ্য করছি, এখন আর কেউই এখন যাতায়াতের জন্য উঁট বা ঘোড়া ব্যবহার করে না। বরং দ্রুতগামী ট্রেন, বাস, গাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান এর স্থান দখল করেছে। এছাড়াও রয়েছে কিছু অপার্থিব নিদর্শন। যেমন রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ লাগবে আর এই নিদর্শনও আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে পূর্ণ হয়েছে আর সেই সময় দাবীদারও বিদ্যমান ছিল। অতএব এই সমস্ত নিদর্শনই পূর্ণ হয়েছে। আর আমাদের বিশ্বাস তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী। এই বিষয়গুলিই অন্যান্য মুসলমান আর আমাদের মধ্যে সংঘাতের কারণ।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের কুরআন করীমের ব্যাখ্যা কি অন্যদের ব্যাখ্যার থেকে ভিন্ন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সমগ্র কুরআনের নয়, তবে কিছু কিছু আয়াতের ভিন্ন। কিন্তু আমরা বলি, যৌক্তিক দলিল না দিয়ে কুরআন করীমের কোন আয়াতের ব্যখ্যা করা যেতে পারে না। কুরআন করীমের কোন আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে হলে তার পিছনে যুক্তি ও দলিল থাকে। যেমন- অন্যান্য মুসলমানেরা বলে, নিঃসন্দেহে কুরআন করীম রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) শেষ নবী আখ্যায়িত করেছে। অতএব অন্য কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, কুরআন করীম মহানবী (সা.) কে নবীগণের মোহর আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ নবী আসতে পারে, কিন্তু রসুল করীম (সা.)-এর মোহরের সত্যায়ন থাকতে হবে, কোন নতুন শরীয়ত বা নতুন কিতাব নাযেল হবে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খোদা কাউকে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন। আমরা খোদা তা'লার গুণাবলীকে সীমাবদ্ধ করতে পারি না। এমনই কিছু বিশেষ বিশেষ আয়াত রয়েছে যেগুলির তফসীরে পার্থক্য পাওয়া যায়, নচেত আমরাও একথার উপর বিশ্বাস রাখি যে, রসূল করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন। তারা খাতামের এই অর্থ করে যে, এখন এর পর আর কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, খাতামের অর্থ হল মোহর আর রসুল করীম (সা.)-এর মোহর নিয়ে নবী আসতে পারে।

সাংবাদিক বলেন, আপনি কিভাবে খলীফা হয়েছিলেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাকে বৈঠকে নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা বানানো হয়েছিল।

সাংবাদিক বলেন: এই সম্পর্কে আপনি একটু বিস্তারিত বলবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন খলীফার মৃত্যুর পর সারা পৃথিবী থেকে নির্বাচন বৈঠকের সদস্যরা একত্রিত হয়ে নিজেদের ভোট দান করেন। ঠিক সেইভাবে যেভাবে পোপের নির্বাচন হয়। রুদ্ধ দ্বারে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেখানে ভোটদান পর্বের সময় সকলেরই ভোটাধিকার থাকে। খিলাফতের জন্য নাম উপস্থাপন করা হয় আর যার সব থেকে বেশি ভোট হয় তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু আপনি খিলাফতের জন্য নিজের নাম উপস্থাপন করতে পারবেন না। একজন নাম প্রস্তাব করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সমর্থন করে। কোন প্রকারের তর্ক-বিতর্ক সেখানে হয় না। কেউ এমন মতামতও ব্যক্ত করতে পারে না যে, আপনি অমুককে ভোট দিন বা অমুককে ভোট দিবেন না। এইভাবে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠ, সুচারু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে আর যে সব থেকে বেশি ভোট পায় তাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। এই সফরগুলির উদ্দেশ্য কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জামাতের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং জামাতগুলিকে নিরীক্ষণ করতে বিভিন্ন দেশের সফরে যাই। কিন্তু আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য রাজনীতিক বা নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা নয়। কিন্তু এই সফরকালে যদি কোন রাজনীতিক সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন বা স্থানীয় জামাতের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকে আর কোন কোন সময় অনুষ্ঠানে রাজনীতিকবর্গ এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার খিলাফতকালে কি উগ্রবাদ খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি নিজের খিলাফতকালকে পূর্বের খলীফাদের খিলাফতের সঙ্গে কিভাবে তুলনা করবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পূর্বের সমস্ত খলীফাই এই কাজই করে এসেছেন। আমাদেরকে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-স্লোগানটি তৃতীয় খলীফা দিয়েছিলেন। অনেক সময় পৃথিবীর বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর শান্তি পরিস্থিতি সামনে রেখে আমি শান্তির উপর জোর দিচ্ছি। অন্যথায় জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা মসীহ মাহদী এবং মাহদী মাহুদ বলে বিশ্বাস করি, তিনি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন। এক, মানবজাতিকে স্রষ্টার কাছে নিয়ে আসা এবং দ্বিতীয়ত নিজের উপর অর্পিত অপরের অধিকার প্রদান করার চেতনা তৈরী করা এবং সমাজে শান্তি, ভালবাসা এবং সমন্বয় তৈরী করা। তাই তাঁর আগমণের দুটিই উদ্দেশ্য ছিল আর তাঁর সমস্ত খলীফাই সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন হয়তো আমি কিছু অন্যান্য বিষয়ে আরও জোর দিব। আর এমনিতেই আমি কেবল এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলি না,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 12 Jul, 2018 Issue No.28

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আরও অনেক সমস্যাবলী রয়েছে যেগুলি আমার দৃষ্টিতে রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের মধ্যে যদি চেতনা সৃষ্টি না হয়, তবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আর তখনই বিশ্বের নেতাবর্গের এবং সাধারণ মানুষের জ্ঞান ফিরবে।

সাংবাদিক বলেন: আমি জানি না মালমোর পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কতটা অবগত। কিন্তু এখানে এখন গুজব রটেছে যে, মালমোতে আইসিসের লোকজন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যুবকদেরকে তাদের সংগঠনে ভর্তি করছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশাসনের দায়িত্ব হল সতর্ক ও সচেতন থাকা এবং এখানে কি ঘটে চলেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

সাংবাদিক বলেন: জামাত আহমদীয়াও কি এ বিষয়ে কিছু করতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর জামাত আহমদীয়ার সম্পর্ক, আমাদেরকে কট্টরবাদী বানানো সম্ভব নয়, আর উগ্রবাদীরা আমাদের লোকদেরকে ভর্তিও করতে পারবে না। আমরা শান্তিপ্রিয় জামাত এবং যতদূর অন্যান্য সম্প্রদায়ে সম্পর্ক, তাদের সম্পর্কে আমি জানি না। আমি নিজেই একথা আপনার কাছে শুনলাম। আপনি যদি কোন সূত্রে একথা জেনে থাকেন তবে প্রশাসনকে অবগত করা আপনার কর্তব্য।

সাংবাদিক বলেন, আমি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম যাতে দাবি করা হয়েছে আপনি নাকি পুলিশকে আর বেশি অস্ত্রসজ্জিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: লন্ডনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশদের হাতে ছোট এক টুকরো লাঠি থাকে। সেগুলি দিয়ে তারা কি করতে পারে? অপরদিকে যারা শহরে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে তাদের কাছে যদি অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র থাকে তবে পুলিশ তাদের সঙ্গে লড়তে চাইলেও তারা সেখানে কি করবে? তাদের সঙ্গে লড়তে গেলে পুলিশদের কাছেও একই ধরণের অস্ত্র থাকা উচিত।

সাংবাদিক বলেন, ইউরোপের যুবকশ্রেণী ইউরোপ ছেড়ে আইসিসে যোগ দিচ্ছে। আপনার মতে এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক মন্দার পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। তাদেরকে যদি যোগ্যতা ও মানসম্মত উপযুক্ত চাকরী দেওয়া হয়, তা খুব বেশি লাভজনক না হলেও অন্ততপক্ষে যেন তাদের পছন্দ মত হয়, তবে তাদের সংখ্যা সন্তোষজনকভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে যারা আর্থিক অনটনের কারণে কট্টরবাদীতে পরিণত হচ্ছে।

প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, ইউরোপে শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে আপনার কি মতামত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই শরণার্থীদের সংখ্য কয়েক লক্ষে গিয়ে ঠেকেছে। ইউরোপের একটিও দেশ এমন নেই যে তাদের সকলকে আশ্রয় দিতে পারে। এর সর্বোত্তম উপায় হল, যে দেশ বর্তমানে সমস্যা পীড়িত তার প্রতিবেশী দেশকে আর্থিক সাহায্য করা এবং সেখানে এদের জন্য শিবির তৈরী করা। আফগান শরণার্থীরা যখন দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই সময় তারাও অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেয়, কিন্তু তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে চলে এসেছিল। সেই সময় সেখানে তাদের জন্য শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল, আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তাদেরকে আফগানিস্তান ফেরত পাঠানো হয়। শরণার্থীদের আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য চাহিদাবলী পুরণ করার জন্য সেই সময় কিছু বৃহত শক্তি ও ধনী দেশ পাকিস্তানকে সহায়তা দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর এই শিবিরগুলি তুলে দেওয়া হয় এবং শরণার্থীদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানেও এটিই সর্বোত্তম সমাধান, অন্যথায় আপনি তো জানেন না যে, শরণার্থীদের মধ্যে কে কোন ধরণের? আইসিসের মুখপাত্রের বিবৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক চল্লিশজন শরণার্থীদের মধ্যে একজন করে আইসিস-এর সদস্য রয়েছে। আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন? এই বিবৃতি এখন নথিভুক্ত হয়েছে।

সাংবাদিক বলেন, আপনার মতে শরণার্থীদের জন্য সুইডেন যে নিজের দেশের দরজা উন্মুক্ত করেছে তা নিজের সরলতার কারণে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার প্রশ্ন করেন যে, সুইডেন কত সংখ্যক শরণার্থী গ্রহণ করার জন্য সম্মত হয়েছে?

সাংবাদিক বলেন, প্রাথমিকভাবে দশ হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিল আর এখন এক লক্ষ ষাট হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দিচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: লোকেদের কোথায় রাখা হবে? তাদেরকে কি ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে? কোথাও না কোথাও তাদেরকে রাখতেই হবে। তাই আমার মতে সর্বোত্তম সমাধান হল, তাদের প্রতিবেশী দেশে শিবির গড়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা। তবে যদি মনে করেন এই শরণার্থীদের কারণে আপনার দেশের লাভ হবে তবে ভাল কথা, আপনারা তাদেরকে নিজেদের দেশেই রাখুন। কিন্তু যদি এই শরণার্থীদেরকে নিজেদের দেশেই রাখার নীতি অনুসরণ করা হয় তবে সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এরা সত্যিকার অর্থেই শরণার্থী।

এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি এখনই বললেন যে, খলীফা পোপের মত নির্বাচিত হয়ে থাকে, তবে যে ক্যাথলিক চার্চ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সমকামিতা ইত্যাদি বিষয়ে নিজের মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী সংশোধন নিয়ে আসছে, খলীফা হিসেবে আপনারও কি এই ধরণের চিন্তাভাবনা রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কেবল ইসলামী শিক্ষারই অনুসরণ করব। আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীম শেষ (ঐশী) গ্রন্থ আর এতে পারিবারিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব-স্তরের প্রত্যেক আঙ্গিক সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। অতএব আমাদের কোন জিনিস পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আর যতদূর পোপের সম্পর্ক, তিনি কখনও একথা বলেন নি যে, সমকামিতা বৈধ। কেননা, বাইবেলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমকামিতা অবৈধ ক্রিয়া। বাইবেলে লূত জাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে যে, তাদেরকে নিজেদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে এটি মুষ্টিমেয় লোকের সমস্যা যা প্রচার করার প্রয়োজনই বা কি? এই কারণে এ নিয়ে আইন প্রনয়ণ করার প্রয়োজন কি? যতদূর জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, প্রয়োজনে ইসলাম এর অনুমতি দেয়। ইসলাম মহিলাদেরকে তাদের বৈধ অধিকার প্রদান করে। তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করে। তাদেরকে 'খোলা' নেওয়ার অধিকার দেয়। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারও রয়েছে। আমাদের ধর্মে প্রথম থেকেই আধুনিকতা আছে, এতে আরও আধুনিকতা নিয়ে আসার প্রয়োজন কি?

সাংবাদিক বলেন, আপনি কি নিজেকে feminist হিসেবে দাবী করেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নারী হোক বা পুরুষ, বৃদ্ধ হোক বা যুবক- আমরা তো প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অধিকারই প্রদান করি। নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। না আমরা feminist আর না আমরা নারীদের অধিকার আত্মসাৎকারি।

সব শেষে সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.) কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং হুযুর আনোয়ারের কাছে মসজিদের ভিতরে চিত্রগ্রহণের জন্য আবেদন করেন। হুযুর তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে চিত্রগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। এই সাক্ষাতকার ৪:০৫টায় সমাপ্ত হয়।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.